অমিতাভ ও সায়ন-কে

নাট্যকারের কথা

একেবারেই অল্প সময়ের উদ্যোগে ও অসম্ভব দ্রুততার মধ্যে আমার 'একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। ছাপাতে দেওয়ার আগে একাঙ্ক নাট্যগুলির সব আমার হাতের কাছে ছিল না। যেগুলি ছিল সেগুলির বেশীর ভাগই প্রেসে দেবার মত পাণ্ডুলিপির আকারে ছিল না। আমি একাঙ্কগুলি রচনার সালের ক্রম ধরে সাজিয়েছি। ছাপার কাজ বেশ কিছুটা এগোবার পর আমি 'বাইরের দরজা' একাঙ্কটি খুঁজে পাই। এটি এই সংকলনভুক্ত না হলে, আমি মনে করি, নাট্যসংগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকত। তাই এর অনুপ্রবেশে সালের ক্রমভঙ্গ হলেও দেওয়া হল। পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই এই অনিয়ম শোধরানো হবে। 'বর্ণ বিপর্যয়' নামের এই সংকলনে যাওয়ার মত শেষ একাঙ্কটি খুঁজে না পাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হল না। দ্বিতীয় সংস্করণে সেটা দেওয়া হবে।

রিঙ

[ঘরটা এলোমেলো। কিছু আধুনিক ছবির ক্যানভাস ইতস্তত—দেয়ালে। মেঝেয় ছড়ানো-ছিটোনো। একটা টেবিল ছবি আঁকার সরঞ্জামে প্রায় উপছে রয়েছে। টিনের চেয়ার দু-তিনটে—এ-ধারে ও-ধারে রঙ লেগে আছে। একটা বেশ বড় মাটির ঘোড়া ভাঙা ডান-পাটা শূন্যে তুলে আছে। অরুণ সিগারেটে বেপরোয়া টান দিচ্ছে, মুখে অস্থিরতা, দৃষ্টি অনির্দিষ্ট। ওর চেহারায় বিপর্যস্ত তারুণ্য। অরুণের অন্যমনস্কতার মধ্যে ওর স্ত্রী শীলা এসে এক কোণে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে রাত একটার ঘণ্টা বাজে। অরুণ কিছুটা চমকে ঘাড় ফেরাতে শীলাকে দেখে। শীলা ছিমছাম মার্জিত চেহারার মেয়ে—মুখটা বিষণ্ণ।]

অরুণ। একি এখনো ঘুমোও নি?

শীলা। ডাক্তারবাবু কি এত রাত্রে আর আসবেন? মিছিমিছি জাগছ, শুয়ে পড়।

অরুণ। না-না ঠিক আসবে। ওর সঙ্গে আলোচনা ভয়ানক জরুরি তুমি শুয়ে পড়।

শীলা। ঘুম পাচ্ছে না।

অরুণ। (পকেট থেকে ট্যাবলেট বের ক'রে) এই নাও এই ঘুমের ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও।

শীলা। ও-ট্যাবলেটে কিছু হয় না।

অরুণ। বেশ, দুটো খাও।

শীলা। আজকে আমাকে ঘুমোবার জন্য এত জোর করছ কেন বলতো? কিছু একটা তোমার মাথায় ঘুরছে। আজ সারাটা দিন, তোমাকে অস্থির দেখাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই তুমি যেন কেমন একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছ!

অরুণ। আমাকে কোন রকম সন্দেহ করছ, মনে হচ্ছে।

শীলা। তুমি আমাকে সন্দেহ করো, না?

অরুণ। আমার উপায় ছিল না। তুমি যদি রিঙ দুটো ফিরিয়ে দিতে কোন রকম ঝঞ্ঝাট-ই হোত না।

শীলা। আমি তোমার রিঙ্‌ নেইনি।

অরুণ। (একটা রঙ আঁচড়ে-আঁচড়ে তোলা ঝোলানো ক্যানভাস দেখিয়ে) ক্যানভাসটার দিকে তাকাও, তোমার মায়া হবে। আমাদের অমন প্রিয় ছবিটা থেকে তুমি যে কি করে রিঙ্‌ ছুটো আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিতে পারলে। ছবিরও গায়ে আঘাত লাগলে রক্ত পড়ে—আমি তোমার নখে ঐ রক্ত দেখেছিলাম। সন্দেহ আমার অমূলক নয় শীলা !

শীলা। আমার নখে কি করে রঙ লেগেছিল, আমি জানি না। তোমার টেবিল গোছাতে গিয়ে প্যালেট থেকেও লাগতে পারে।

অরুণ। (ক্ষুব্ধ ভাবে) আমাকে বোঝাতে চেষ্টা কোর না, আমি রঙ চিনি। ওটা আমার ক্যানভাসের রঙ। শুকনো রক্তের মতো তোমার নখে লেগেছিল। তোমার ছুটো হাত আদর করে ধরতে গিয়ে আমি যেন সাপের ছোবল খেলাম। এ-সব তুমি হিংসায় করছ !

শীলা। হিংসা ?

অরুণ। হ্যাঁ, হিংসা ! তুমি দিনের পর দিন আয়তনে ছোট হয়ে যাচ্ছ—আর তার থেকে তোমার মধ্যে স্পষ্ট একটা কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে টের পাচ্ছি। তোমার ধারণা তুমি ছোট্ট হয়ে যাচ্ছ বলে আমি তোমাকে মনে মনে বিতৃষ্ণায় ত্যাগ করছি। কিন্তু আমি তোমাকে এখনো আপন ভাবি।

শীলা। মিথ্যে কথা। রোজ এসে তুমি আমাকে মাপো। আর যেই ছাখো, আর একটু ছোট হয়ে গেছি অমনি তোমার মুখটা কেমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

অরুণ। নিষ্ঠুর নয়, করুণ হয়ে ওঠে।

শীলা। নিষ্ঠুর মুখ কাকে বলে আমি চিনি। তাছাড়া তোমার আচরণ, সেটাও কি দিনের পর দিন বদলাচ্ছে না ?

অরুণ। তুমি ভুল ভাবছ।

শীলা। ভুল আমি ভাবি না।

[বাইরে কড়া নড়ে ওঠে। অনেকগুলো গলা শোনা যায়। অরুণ চঞ্চল ভাবে উঠে পড়ে। দরজা খুলতে যায়।]

অরুণ। বললুম, তুমি ঘুমিয়ে পড়!

শীলা। দাঁড়াও দরজা খুলনা। আগে বলো এত রাত্রে কারা এল? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এদের জন্যই অপেক্ষা করছ! ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই নন—অনেকগুলো অন্য রকম গলা পেলাম।

অরুণ। তুমি ভিতরে যাও।

শীলা। আমাকে ও-ঘরে পাঠালেই সব কথাবার্তা আড়াল হয়ে যাবে ভাবছ? আমি শুনতে পাব না?

অরুণ। কি আশ্চর্য, ওদের কি বাইরে এত রাত্রে দাঁড় করিয়ে রাখব?

শীলা। ওরা কারা?

অরুণ। পুলিশের লোক।

শীলা। পুলিশের লোক কেন?

অরুণ। আমি ডেকেছি।

শীলা। কেন?

অরুণ। ওরা বাড়িটা সার্চ করবে। রিঙ্ দুটো আমার চাই।

শীলা। তার মানে, তুমি নিশ্চিত হয়ে আছ, আমি তোমার ক্যানভাস থেকে রিঙ্ দুটো চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি।

অরুণ। বলেছিতো, আমার যা ধারণা হয়েছে, তোমাকে তা লুকিয়ে অসৎ হতে চাইনি। তোমাকে বারবার ফিরিয়ে দিতে বলেছি, তুমি কানেই তোলনি, অগত্যা আমার উপায় ছিল না।

শীলা। আমি নেইনি।

অরুণ। ওঁরা খোঁজার পরেই প্রমাণ হবে। যদি না পাওয়া যায় আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিও মিটে যাবে।

[বাইরে তীব্র কড়া নড়তে থাকে।]

অরুণ। খুলে দিচ্ছি।

শীলা। যা খুশি কর! কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করলে!

অরুণ। অপমান করতে আমি চাইনি। খুলে দিচ্ছি।

[দরজা খুলে দেয়। একজন অফিসার কয়েকজন পুলিশ সহ ঢোকে।]

অফিসার। নমস্কার।

অরুণ। নমস্কার।

অফিসার। এখনো রিঙ্ টুটো পান নি?

অরুণ। না।

অফিসার। তাহলে সার্চ করতেই হবে?

অরুণ। সেজন্যই আমি আপনাদের ডেকেছি।

অফিসার। (পুলিশদের) তোমরা ভিতরের ঘরগুলো খুঁজতে থাকো। কেউ ওদের হেল্প করবে নিশ্চয়ই, মানে বাক্সের চাবিগুলো চাই, সার্চের সময় অবশ্য কাছে থাকা যাবে।

শীলা। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

[অরুণ শীলার দিকে তাকায়। শীলা গম্ভীর। পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে শীলা ভিতর ঘরে চলে যায়। অফিসার ওকে লক্ষ্য করে।]

অফিসার। আপনার স্ত্রী? উনি কতদিন ধরে ছোট হচ্ছেন?

অরুণ। সাত আট বছর।

অফিসার। কত ইঞ্চি ক'রে ছোট হন?

অরুণ। ইঞ্চি মেপে হন না—আমি টের পাই। ও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

অফিসার। তাহলে উনি অনেক লম্বা ছিলেন বলেন?

অরুণ। না, খুব একটা নয়।

অফিসার। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ গোলমেলে লাগছে। আচ্ছা, আপনার সেই ছবির ক্যানভাসটা কোথায়, যেখান থেকে রিঙ্ টুটো চুরি গেছে?

অরুণ। (ক্যানভাসটা দেখিয়ে) ঐ দেখুন, কি রকম আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিয়েছে।

অফিসার। ছবিটায় কি কেবল রিঙ্‌-ই ছিল ?

অরুণ। ছবিটাকে আমাদের একটা যৌথ পোর্ট্রেট-ও বলতে পারেন। পারেন। সাবজেক্টটা ছিল, যেন আকাশ থেকে, কিংবা ধরুণ তারো উঁচু থেকে।

অফিসার। আকাশ থেকেও আবার উঁচু কোন্ বস্তুটি ?

অরুণ। ব্যাপারটা আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আকাশের উপরে আকাশ—বুঝতে পারলেন ?

অফিসার। না।

অরুণ। তাহলে আপনি আমার স্টেটমেণ্টটা কেবল লিখে যান।

[অফিসার ঘাড় নেড়ে নোট করতে প্রস্তুত হয়]

অরুণ। সেই রহস্যময় উঁচু থেকে দুটো দড়ি ঝুলছিল, তার সঙ্গে আমি দুটো রিঙ্‌ আঁকলুম। এটা আমার ছবি।

অফিসার। [ভূতের গল্প শোনার মত মুখ। নোট নিতে থাকে] তারপর ?

অরুণ। আমি ঐ রিঙ্‌ দুটোয় নানা রঙের পালকের দুটো পাখি দুলিয়ে দিলুম।

অফিসার। পাখি দুটো দেখছিনাতো।

অরুণ। রিঙ্‌ নেইতো। কয়েকদিন ওরা হাওয়ায় ঝুলে থাকল। ওদের খাঁচাই বলুন, আর আশ্রয়ই বলুন কিংবা আনন্দ—সেতো ঐ রিঙ্‌ দুটো। রিঙ্‌ চুরির পর ওরা দু-একদিন অসহায় ঝুলতে ঝুলতে আর্তনাদ করে চেঁচামেচি করল। তারপর একদিন : কোথায় উড়ে গেল।

অফিসার। পাখিদুটোর যে রকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তাতে ওরা হয়ত বেশিদূর উড়েও যেতে পারে নি ; হয়ত কাছাকাছি কোথাও ডানা ভেঙে পড়ে আছে। কাছাকাছি চারিদিকটা খুঁজে দেখেছেন ?

অরুণ। মন্দ বলেন নি খুঁজতে হবে।

অফিসার। আর একটা সন্দেহও আমার মাথায় উঁকি দিচ্ছে—এওতো হতে পারে শীলা দেবী ঐ পাখি দুটোও লুকিয়ে রেখেছেন।

অরুণ। এটা কিন্তু ভাবি নি।

অফিসার। ভাবতে হবে। ভাবার জন্য মাথা দরকার। আমাদের এটাই কাজ কিনা। আমাদের মধ্যে যে যত সন্দেহ করতে পারে, তার তত উন্নতি। আপনাকে আর একটা অনুমানের কথাও বলতে পারি। অর্থাৎ পাখি দুটো আর বেঁচে নেই।

অরুণ। বেঁচে নেই ?

অফিসার। থাকবে কি করে ? ওদের লুকিয়ে রাখতে হলে, মেরে ফেলাই স্বাভাবিক।

অরুণ। আমি কিন্তু এতটা ভয়ংকর কিছু ভাবতে পারি নি।

অফিসার। ভাবতে গেলে মাথা চাই, বুঝলেন ? আমাদের এটাই কাজতো। আমাদের মধ্যে যে যত অশুভ অনুমান করতে পারবে, সে তত বড় হবে। দেখবেন, আমি কত বড় হই।

[বাইরে আবার কড়া নড়ে। অরুণ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে।]

অফিসার। কে ? এত রাত্রে ?

অরুণ। ডাক্তারবাবু। উনি নিজের ইচ্ছেয় শীলার কেসটা টেক্ আপ করেছেন। উনি একজন হিপ্‌নোটিস্ট। দাঁড়ান খুলে দিচ্ছি।

অফিসার। একটু কাল অপেক্ষা করুন। আমি বন্দুকটা বের করেনি। যে-ই আসুক আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। না-জানিয়ে যদি আমার মা আসেন তাহলেও আমার রিভলবার লোডেড্ রাখব। আমাদের মধ্যে যে যত

বেশি সতর্ক হবে সে তত বড় হবে। (বন্দুক হাতে রাখে) এবার খুলে দিন।

[অরুণ দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পাবার মতো মুখ করে। দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে]

অরুণ। কাউকে তো দেখলাম না। অথচ কড়াটা বেশ জোরে নড়ল না?

অফিসার। বেশ জোরে। সম্ভবত আমার বন্দুকের কথা শুনে পালিয়েছে। একটু সাবধানে থাকবেন।

অরুণ। এ-ও হতে পারে, সেই পাখি দুটো ঘরে ঢুকতে চাইছিল। ঠোঁট দিয়ে কড়াটা নেড়ে আমাকে ডাকছিল।

অফিসার। তার মানে পাখির ভূত! এ ব্যাপারে কিন্তু আমি আপনাকে হেল্প করতে পারব না, কারণ আমার বন্দুকে আজ অবধি কোন ভূত মারা পড়েনি। অবস্থাটা কিন্তু ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আমাদের দায়িত্বটা দ্রুত শেষ করে ফেলা উচিত। ওদের ভিতরে গিয়ে একটু তাড়া দিন না।

অরুণ। আমি দরজাটা তাহলে খুলেই রাখি, কি বলেন? পাখি দুটোর আত্মা যদি আসতে চায়, আসুক। ওরা আমাকে চায়।

অফিসার। কিন্তু আমাকে তো চায় না, বুঝলেন তো। আমার কাঁধ দুটো বেশ চওড়া দেখছেন তো। দাঁড় ভেবে যদি প্রেতাত্মা দুটি বসে পড়ে, সে কি রকম সাংঘাতিক ব্যাপার হবে ভাবুন। অহেতুক জড়িয়ে কি লাভ বলুন। আমাদের মধ্যে যে যত অকারণে—জড়াতে না চায়, সে তত বড় হয়। বড় হতে গেলে, আমার উঠে পড়াই উচিত, তাই না? [চেঁচিয়ে ডাকে] রামসিং!

[পুলিশের দলটা ফিরে আসে]

অফিসার। পেলে?

রামসিং। কুছ্ মিলা নেই, সাব্।

অফিসার। তাহলে আর কি, উঠে পড়ি। তোমরা বেরোও, আমি আসছি। শোন, বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ কিছু দেখে চমকে উঠলে চেঁচিও ; তাহলে আর আমি বেরুব না, মানে কাল ভোরে যাব। কেবল ডিউটিই বড় কথা নয়— নিজেকে বাঁচিয়ে না রাখলে ডিউটি দেবেটা কে? রাম সিং, তোমরা তাহলে বেরোও।

[পুলিশের দল বেরিয়ে যায়]

অফিসার। রামসিং!

রামসিং। (বাইরে থেকে) হুজুর!

অফিসার। বাহার মে চাঁদনিকা আলো হ্যায়?

রামসিং। হা হুজুর।

অফিসার। আচ্ছা, তাহলে উঠি, বাইরে আলো আছে। বুঝলেন, আলো ছাড়া চলবেন না। চাঁদের আলোতে তো সবটা দেখা যায় না, বাকিটা টর্চে দেখে নেব। তবে সাবোর্ডিনেটের সামনে আমি টর্চ জ্বালতে চাই না। কিন্তু আজকে জ্বালব। উঠি।

[কড়া নড়ে উঠল। অফিসার উঠতে গিয়ে চমকে আবার বসে পড়ে]

অফিসার। বসলুম, মানে, আপনাকে আর একটু সাবধান করা প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা লোহার চাবি হবে?

অরুণ। কেন বলুনতো। লোহা সঙ্গে থাকলে যে কোন রকম প্রেতাত্মা কাছেই ঘেঁষতে পারে না, বন্দুকটাইতো সব নয়। আমাদের পুলিশি আইনে, বন্দুকটা যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই বাহাদুরী।

[অরুণ একটা চাবি দেয়]

অফিসার। উঠি।

অরুণ। আসুন।

[প্রৌঢ় ডাক্তার ঢোকে। কেমন কৌতুককর চেহারা]

অরুণ। আরে ডাক্তারবাবু! আপনি কি আগে কড়া নেড়েছিলেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ, কড়াটা নেড়েই হঠাৎ দৌড়ে পাশের বাগানে গেলুম।

অরুণ। বাগানে?

ডাক্তার। হ্যাঁ, একটা ব্যাপার চেঞ্জ্ করলুম।

অরুণ। কি চেঞ্জ্ করছিলেন?

ডাক্তার। (অফিসারের দিকে তাকিয়ে) বলছি।

অফিসার। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তাহলে আপনিই কড়াটা নেড়ে ছিলেন? হ্যাঁ, অরুণবাবু, আপনার চাবিটা নিন। বন্দুক ছাড়া যে কোন কিছুই আমার কাছে ভারি লাগে। রাখুন। (চাবিটা দিল) নমস্কার। এখন বেশ হাল্কা লাগছে। চলি।

[চলে যায়। ডাক্তার বসে।]

ডাক্তার। সার্চ করতে এসেছিল তো?

অরুণ। হ্যাঁ।

ডাক্তার। পাওয়া গেল?

অরুণ। কিছু না।

ডাক্তার। আমার ট্রিটমেণ্ট ছাড়া পাওয়া সম্ভব না। একটা হিপনটিক্ স্পেল দেব দুজনকে, ওতেই কাজ দেবে। শীলাকে ডাকো।

অরুণ। ও-আমার উপর চটে আছে। যদি দয়া করে আপনি ডাকেন!

ডাক্তার। (চেঁচিয়ে) শীলা, শীলা! এদিকে একবার এসোতো মা।

[শীলা ঢোকে। মুখটা বিরক্ত]

ডাক্তার। সার্চ করে কিছু পায়নিতো? পাবে না জানি।

শীলা। ডাক্তারবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, আমি একটু শুয়ে পড়ব। অপমানের সীমা থাকা দরকার।

ডাক্তার। তোমার ভয় নেই, আমি রিঙ্ দুটো আর পাখি খুঁজে

বের করব। আর যদি পাওয়া যায়—তোমার ছোট হয়ে যাবার ওষুধ পর্যন্ত তৈরী। আমাকে বিশ্বাস কর। বোস, বোস তুমি। (শীলা বসে) এইতো লক্ষ্মী মেয়ে।

অরুণ। ভেবেছিলাম, আপনি আরো আগে আসবেন।

ডাক্তার। কিছুটা আগে অবশ্য এসেছিলাম, তোমাদের বাগানের মধ্যে ছুটতে গিয়ে আবার দেরী করে ফেললাম।

শীলা। হঠাৎ বাগানে গেলেন ?

ডাক্তার। বাগানে গেলাম বলেই তো বিরাট রকম আবিষ্কারের হয়ত একটা সূত্র পেয়ে গেলাম। আমার চোখের সামনে আকাশ থেকে একটা নক্ষত্র ছিঁড়ে পড়ল, ঐ উল্কাপাত আর কি ! দেখলুম, তোমাদের টগর ফুলগাছটার কাছে পড়ল, দৌড়ে ধাওয়া করে গেলুম ওখানটায়।

শীলা। নক্ষত্রটা দেখতে পেলেন ?

ডাক্তার। নিশ্চয়।

অরুণ। তখনো পড়ে পড়ে জ্বলছিল নিশ্চয়ই।

ডাক্তার। জ্বলবেনা মানে, নিভে গেলে তারা দেখা যায় নাকি ! ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, জ্বলছে আবার নিভছে—মানে প্রাণটা দপ্ দপ্ করছে আর কি ? কি করব ভাবছি—

অরুণ। তুলে নিয়ে এলেন না কেন ?

ডাক্তার। এনেছি।

শীলা। কোথায় ?

ডাক্তার। আমার কোটের পকেটে। দেখছনা, দুটো সেফটিপিন দিয়ে, পকেটের মুখটা আটকে রেখেছি। এটাকে নিয়ে এখন মহা সমস্যা, ধুঁকছে—কি খেলে বাঁচবে, কি ওষুধে জোর পাবে—সেতো আর আমাদের মেডিক্যাল শাস্ত্রে নেই।

শীলা। একটু উঁকি মেরে দেখব ?

ডাক্তার। একটা সেফ্‌টিপিনের ফাঁক দিয়ে আলগোছে ছাখো।

[শীলা উঁকি দেয়]

অরুণ। কি করছে তারাটা ?

শীলা। একেবারে অন্ধকার। (পরমুহূর্তে) জ্বলছে, কি মিষ্টি আলো জ্বলল।

অরুণ। সরো, এবার আমি দেখব।

[অরুণ উঁকি দিল]

ডাক্তার। আমিও অনেকক্ষণ দেখিনি ওকে। কি ? জ্বলছে ?

অরুণ। (চেঁচিয়ে) ঐ যে জ্বলল, কি চমৎকার আলো ! আমার গোটা ক্যানভাসটা জুড়ে যদি এই আলোটা আঁকতে পারতুম। আবার জ্বলল।

শীলা। যদি না বাঁচে ডাক্তারবাবু ! কিছু খাওয়ান। আপনার পকেটে দু চামচে দুধ ঢেলে দেব, চুকচুক করে খাবে।

অরুণ। দাঁড়াও, চকলেট আছে, তারাটা বাচ্চা মতো আছে দেখছ না !

শীলা। খাবে কি করে ? ডাক্তারবাবু ওর দাঁত আছে ?

ডাক্তার। এখনো পুরোপুরি কিচ্ছু জানি না। কালকে গোটা দিন পরীক্ষা করতে হবে।

অরুণ। শীলা কালকে আমরা দুজনে বসে বসে সব ব্যাপারটা দেখব, আমরা থাকব আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার। গ্ল্যাডলি, তোমাদের চিকিৎসা করতে এসেইতো প্রাণীটাকে পেলাম।

শীলা। যা খাওয়াতে বলবেন, আমি খাইয়ে দেব কিন্তু।

অরুণ। কোন বেড়াল বা পাখী এসে না ঠুকরে দেয় আমি দেখব।

শীলা। তুমি যা কাজের আমার জানা আছে !

অরুণ। কথা বোলনাতো, নিজে বেশ একা একা মজাটা পেতে চাও।

ডাক্তার। দেখেছো, তোমরা দুটিতে কেমন সহজে হাসিখুশী হতে পারো। তারাটা পেলুম বলেই বুঝতে পারলুম, চিকিৎসা

করলে তোমরা সেরে যাবে। ভিতরে যখন, তোমাদের ছেলেমানুষীটা একেবারে মরেনি, তখন সারবে না মানে ?

অরুণ। তাহলে আপনি এতক্ষণ আমাদের চিকিৎসা করছিলেন ? ওটা কি ? পকেটে ওটা কি জ্বলছে তাহলে ?

ডাক্তার। ওটা কি, আমি সত্যই এখনো জানি না। চোখের সামনে আকাশ থেকে পড়েছে এটা সত্য কথা। দেখতে এবং চরিত্রে অনেকটা জোনাকির মতো।

শীলা। ও জোনাকি ? তা-ই বলুন।

অরুণ। ও রকমই দপ্ দপ্ করছিল।

ডাক্তার। কিন্তু ওটা আকাশ থেকে পড়েছে, সন্দেহ নেই। আমার ধারণা আকাশে যতগুলো তারা দেখি ওদের মধ্যে অতিকায় কিছু জোনাকিও ঘুরে বেড়ায়। যাক্ ওটা আমার অন্য গবেষণার বিষয়। তোমরা দুজনে বসে পড়, শরীর রিলাক্স কর—আমি হিপ্নোটাইজ করব। তোমরা নিজেরাই বলবে, পাখি দুটো কোথায়, রিঙ্ দুটো কোথায় ? আমি তোমাদের দুজনকেই সন্দেহ করি।

অরুণ। আমার জিনিষ আমি চুরি করব ?

ডাক্তার। এটাই বেশী হচ্ছে।

শীলা। এবার ধরা পড়বে, আসল চোর কে ?

অরুণ। আমি নির্ভয়।

ডাক্তার। দুজনে ইজি চেয়ার দুটোয় শুয়ে পড়। আমি দুহাতের দুটো তর্জনি তোমাদের কপালে রাখছি—বাইরের জগৎ থেকে ঘুমিয়ে পড়, চোখ বোজ, চোখ বোজ···চোখ বোজ···ভেরী গুড, অরুণ শীলা কি ছোট হয়ে যাচ্ছে ?

অরুণ। (আচ্ছন্ন কণ্ঠে) হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু আমাদের বিয়ের আগে আমার দুটো হাতের মধ্যে যেন ওর মুখখানা ধরতনা,··· এখন একটা ছোট্ট নাক-চোখ শূন্য মারবেলের মত এতটুকু। আমি স্পষ্ট বুঝি, ওর দুটো চোখ ছোট্ট হয়ে গিয়েছে।

···হৃদয়টা সব জিনিষ রাখতে পারে না, উপচে মাটিতে পড়ে যায়। পায়ের ষ্টেপগুলো কি ছোট হয়ে যাচ্ছে!

ডাক্তার। শীলা, তুমি কি ছোট হয়ে যাচ্ছ?

শীলা। ডাক্তারবাবু, কিছুদিন ধরে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। আগে ও যখন আমার সঙ্গে কথা বলত আমার মনে হোত ছড়িয়ে যাচ্ছি···হাঁটলে মনে হোত ভীষণ সুখে ছোট্ট মেয়ের মতো দৌড়তে পারি···ও মুঠো তুলে যা দিত, বুকের মধ্যে সব ধরে যেত, যা দেখতে বলত চোখের মধ্যে সমস্তটা ধরা পড়ত। এখন ওকে ছুঁলে কেমন আগের মতো লাগে না—যেন ঠাণ্ডা একটা হাত, আর ঠাণ্ডায়তো সব কিছুই গুটিয়ে কমে আসে। আমি এ সব চাইনি, ও আমাকে কেন এ রকম করল?

ডাক্তার। অরুণ, তুমি শীলার কথা শুনেছ? কিছু বলার আছে?

অরুণ। আমি কিছু বুঝি না, কেবল উদ্ধার চাই।

ডাক্তার। তুমি কিছু বলবে শীলা?

শীলা। আমি কিছু বুঝি না, কেবল আগের মতন হতে চাই।

ডাক্তার। শীলা, তুমি রিঙ্ দুটো নিয়েছ?

শীলা। হ্যাঁ।

ডাক্তার। নিয়ে আসতে পারবে?

শীলা। পারব।

ডাক্তার। তুমি যাও।

[শীলা আচ্ছন্নের মতো উঠে যায়]

ডাক্তার! অরুণ, তোমার রিঙ্ আসছে, শীলা আনতে গেছে।

অরুণ। [স্বপ্নাবিষ্ট] আমি জানতাম।

ডাক্তার। তুমি রিঙে তোমাদের না এঁকে পাখি দুটো আঁকলে কেন?

অরুণ। ছোট বেলায় একটা রুপোর কলিং বেলের স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওটা বাজালে মানুষের বদলে বনের পাখিরা আসত।

[শীলা একটা গহনার বাক্সে করে রিঙ্ দুটো নিয়ে আসে। স্বপ্নাবিষ্ট ওর হাঁটা। বাক্সটা এনে মেলে ধরে।]

ডাক্তার। লক্ষ্মীমেয়ে। বোস। অরুণ, কেবল শীলা নয় তুমিও ছোট হয়ে গেছ, তাই-ই শীলা তোমার মুঠোয় ধরে না। তোমারও চোখ ছোট হয়ে গেছে, তাই সব কিছু ছোট দেখ। তোমাদের দুজনকেই লম্বা হতে হবে। তার আগে তুমি ক্যানভাসের পাখি দুটো নিয়ে এস। তুমি তো লুকিয়ে রেখেছ, তাই না?

অরুণ। হ্যাঁ, কিন্তু কখন চুরি করেছি জানি না।

ডাক্তার। ঘুমের মধ্যে তুমি যখন হাঁটো, তারই মধ্যে এক সময় ও দুটো খুলে এনেছ। তুমি যাও নিয়ে এস। যাও।

[স্বপ্নাবিষ্টের মতো ড্রয়ার খুলে অরুণ একটা রঙের বাক্স ডাক্তারের হাতে এনে দেয়।]

ডাক্তার। এবার তোমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এস, ফিরে এস। চলে এস, চলে এস। (ওরা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সহজ দৃষ্টিতে তাকায়) নাইস। শীলা, অরুণ—এবার তোমরা বুঝতে পারছ, দুজনেই চোর এবং দুজনেই ছোট হচ্ছো। স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় তোমাদের কথাবার্তা কাজ কর্ম তোমাদের মনে আছে?

অরুণ। আছে। আশ্চর্য!

শীলা। আমরা এখন কি করব, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। অরুণ, তুমি ঐ রিঙ্ দুটো ক্যানভাসে জুড়ে দাও।

(অরুণ সুতো সমেত রিঙ্ দুটো ক্যানভাসে ঝুলিয়ে দিল)

ডাক্তার। এবার পাখি দুটোকে তোল।

অরুণ। (বাক্সটা খুলে) একি, সব ডানাগুলো ভাঙাচুরো, রঙ চুরমার হয়ে আছে। কি হবে?

ডাক্তার। কোন ভাবনা নেই। ঐ রিঙ্ দুটোয় তোমরা দুজনে দুলবে—পাখি চাই না। পাখির চাইতে মানুষ কম নয়। তোমরা যত দুলবে, তত লম্বা হবার দিকে যাবে। মনে কর, তোমরা দুলছ, দুলছ, দুলছ!

অরুণ। আমার অদ্ভুত লাগছে, আমি ভয়ানক জোরে দুলবো!

শীলা। আমি দেখব, তুমি কি করে আমাকে ছাড়িয়ে যাও?

[স্থির তিনটে মানুষ ঘরে। উজ্জ্বল দুটো আলো ওদের গায়ের উপর দিয়ে দুলতে থাকে। দুলতে থাকে ঘর জুড়ে। পর্দা ক্রমশ নেমে এসে সব কিছু আড়াল করে দেয়।]

বাজপাখি

[মধ্যবিত্ত পরিবেশের একটি ঘর। টেবিলে একটি ফোন। রিসিভারটা টেবিলে নামানো। নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালক মঞ্চ-নির্দেশনা স্থির করবেন। একটা ট্রানজিস্টার রেডিওতে সকালের কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। কল্যাণ গামছায় মুখ মুছতে মুছতে ঢোকে। বাইরে থেকে 'কাগজ' বলে একটা হাঁক, সঙ্গে সঙ্গে রোল করা একটা খবরের কাগজ বাইরে থেকে কল্যাণের গায়ে ছুটে এসে লাগে। কল্যাণের বয়স পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ।]

কল্যাণ। (স্বগত) কানা না কি !

[নীচু হয়ে কাগজটা তোলে। গামছাটা চেয়ারের হাতলে রাখে। কাগজ বাঁধা সুতলিটা খুলতে থাকে। পুরোনো ইজিচেয়ার কিংবা একটা তক্তাপোষের ওপর বসতে যায়। রেডিওটা বন্ধ করে। কাগজে মন দেয়।]

কল্যাণ। চা কি দেবে ? (দু এক মুহূর্ত বাদে) কি হোল ?

[শুভা চা নিয়ে ঢোকে]

শুভা। এই তো উঠলে, শুভা কল্যাণের স্ত্রী (কাপটা এগিয়ে) ধরো।

কল্যাণ। (কাগজে চোখ) রাখো।

[শুভা টেবিল থেকে একটা পোস্টকার্ড বা এই ধরণের কিছু নিয়ে তার ওপর চা-টা রাখে। ওধারে গিয়ে টাইম-পিস্‌টায় চাবি মুচড়ে দম দিতে থাকে।]

শুভা। শোনো।···শুনছ,

কল্যাণ। শুনছি।

শুভা। দুনিয়া শুদ্ধ লোক কাগজ পড়ে, তোমার মতো এমন হামলে পড়ে না কেউ। [কল্যাণ চুপচাপ]
চা-টা ওঘরে গিয়ে খাও।

কল্যাণ। কেন ?

শুভা। ও-বাড়ির ফোন এসেছে। ডাকতে পাঠিয়েছি। এক্ষুনি আসবেন।

কল্যাণ। আসবেনটা কে ?

শুভা। সদানন্দ বাবু।

কল্যাণ। ওঃ! রোজ এই একটা লোকের জ্বালাতন! একটা মিনিমাম কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কোনো লোক পরের বাড়ির ফোন এভাবে ইউস করে না বুঝলে!

শুভা। থামো, এক্ষুণি এসে পড়বেন।

কল্যাণ। তা আসুক না। ফোন করে চলে যাবে। রাজ্যের ফোন আসবে আর আমি এঘর ওঘর ছুটে বেড়াবো! উনি কি ফুটবল খেলবেন যে মাঠের মতো সব ফাঁকা করে দিতে হবে।

শুভা। চেঁচিও না!

কল্যাণ। রাখোতো, চেঁচাবে না! এটা পাবলিক ফোন না! এবারের বিলটা দেখেছ? পয়সাটাতো আমাকে গুণতে হয়!

শুভা। তা এসব আমাকে শোনাচ্ছ কেন?

কল্যাণ। এবার বলে দিও—কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে বলতে হয়।

শুভা। আমি কেন বলতে যাব? নিজে বলো না।

কল্যাণ। আমার ঠিক আসে না।

শুভা। আমারো আসে না।

[শুভা রান্নাঘরে যেতে যেতে ঘোরে। আলনা থেকে একটা গেঞ্জি নিয়ে কল্যাণকে দেয়।]

কল্যাণ। কি হবে?

শুভা। গেঞ্জিটা প্যান্টে নাও। বাইরের লোকের সামনে ফাটা গেঞ্জিটা পরে থাকবে?

কল্যাণ। এতো আচ্ছা জ্বালাতন! (গেঞ্জিটা পাল্টায়) সে পার্টির তো পাত্তা নেই? খবরটা পেয়েছে তো?

শুভা। হয়তো চানে ঢুকেছেন। তোমার মতো অফিসটাকে তো কেউ হতচ্ছেদ্দা করে না। সব টাইমে চলে (হাতলের গামছাটা তুলে) সেই গামছাটা আবার এখানে রেখেছো? রোজ সেই এক? (কল্যাণ সিগারেট টেনে কাগজ পড়ে

যায় চুপচাপ) গামছাটা কিছুতে বাথরুমে রাখবে না ? হয় চেয়ারে, নাতো খাটে, নয়তো দরজার ওপর। এরকম করলে মানুষ পারে না (কল্যাণ সিগারেটের ছাই মেঝেয় ফেলে যাচ্ছে) আবার মেঝেয় ছাই ফেলে যাচ্ছ ?

কল্যাণ। অ্যাসট্রে পাচ্ছি না।

(টেবিল থেকে কাছে এনে সজোরে রেখে)

শুভা। এটা কি ? ক'বার করে ঝাড়ু দেব বলতে পার ! ঘরময় ছাই করবে······

কল্যাণ। ছাই থাক।

শুভা। কি ?

কল্যাণ। ছাই থাক। বড্ড পিটপিটে হয়ে যাচ্ছ। ছাই কিছু খারাপ না মহাদেব গায়ে মাখতেন।

শুভা। তা তুমিও গায়ে মেখে বসে থাকো না ! নোংরামো সহ্য না হলেই পিটপিটে ! পায় পায় ছাইগুলো সারা ঘর, বিছানা—ভালো লাগে না আমার।

কল্যাণ। আমারো ভালো লাগে না। হাজার দিন বলেছি, সকালবেলা উঠে শান্তিতে একটু মন দিয়ে কাগজটা পড়বো,···এ সময় জ্বালাতন কোরো না—কথাটা তোমরা একদিনের জন্যও দাম দিয়েছ ? এক্ষুণি অফিস দৌড়ব। সারাটা দিনতো পরিপাটি করে ঘুমোবে।

শুভা। দ্যাখো, রোজ রোজ এ এক ঝগড়া তুলো না বলছি—ভালো লাগে না। সংসারে কার কতো খাটুনি সেটা জানতে গেলে তোমার জিত হবে না, সেটা তুমি ভালো করেই জানো। এ বাড়িতে টেনে এনে আমাকে কতটা সুখ-শান্তি দিয়েছ, সে কেবল আমিই হাড়ে হাড়ে জানি।

কল্যাণ। আর কথা বাড়িও না।

শুভা ! কথা কে বাড়াচ্ছে ? আমি না তুমি ?

কল্যাণ। আমি কাগজ পড়ছি।

শুভা। ঐ কাগজে মুখ ঢেকেই সংসারটা খেয়েছ।

কল্যাণ। চেঁচিও না, ভদ্রলোক এসে পড়বেন।

শুভা। কেন, আমি চেঁচালেই যত দোষ না? অমনি গার্জেনি শুরু হোল। তোমরা জাতটাই বেয়াক্কেলে।

কল্যাণ। জাত নিয়ে কথা তুলো না, সে অনেক সময় লেগে যাবে—ওসব যাক।

[সুব্রত ঢোকে]

সুব্রত। কাঁচিটা কি করলে?

শুভা। কি?

সুব্রত। কাঁচি, কাঁচি।

শুভা। মেসিনের বাক্সে নেই?

সুব্রত। না।

[শুভা খোঁজে]

সুব্রত। দাদা, ও দাদা!

[কল্যাণ তাকায়]

সুব্রত। আজকে কিন্তু মিটিং ছটায়।

কল্যাণ। কালীতলার মাঠে?

সুব্রত। হুঁ।

কল্যাণ। অফিস ফেরত এসে তোর বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

শুভা। হয়েছে। আদিখ্যেতা! একদিন সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে যেতে বছর ঘুরে যায়—উনি আমাকে মিটিং নিয়ে যাবেন!

[কাঁচিটা দেয়]

শুভা। কি কাটবি?

সুব্রত। কাগজ।

শুভা। পিসবোর্ড টিসবোর্ড কাটবি না?

সুব্রত। একদম না।……বৌদি, চলো না……মিটিং-এ।

শুভা। তোমরা দাদা-ভাই দুজনে আগে দেশোদ্ধার করে এস!

সুব্রত। ফোন এসেছে কার?

শুভা। সদানন্দবাবুর। নন্তুকে খবরটা দিতে বললাম, কি জানি দিয়েছে কিনা। তুই একবার যা না।

সুব্রত। চেপে যাও। দিনের মধ্যে দশবার ওর বাড়ি ছোটো—সদানন্দবাবু ফোন…সদানন্দবাবু ফোন…।

সদানন্দ। (নেপথ্যে) আসচি, এসে গেচি।

[হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢোকেন সদানন্দ। বসে পড়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা চেপে ধরেন, ওরা ছুটে যায়। খালি গা, তেল চুকচুক করছে সদানন্দবাবুর টাকের ধারের চুল।]

কল্যাণ। কি হোল ?

শুভা। পা টা হঠাৎ হড়কে গেছে বোধ হয়।

কল্যাণ। (সুব্রতকে) কিরে, তোর ঐ পোষ্টার সাঁটার আঠাফাঠা ফেলেছিস নাকি ?

[সদানন্দ আস্তে আস্তে ওঠে]

সুব্রত। আঠা ফেলতে যাব কেন ?

সদানন্দ। মিছে ধমকাচ্ছেন বেচারাকে। হোঁচট খাওয়া আমার হবি।

সুব্রত। হবি ? হোঁচট খাওয়া ?

সদানন্দ। হবি মানে, হেবিট। রঙ্গ করে বলি 'হবি'। দিনের মধ্যে যে কতবার হোঁচট খাচ্ছি।

শুভা। আঙ্গুলটায় খুব লেগেছে মনে হচ্ছে।

সদানন্দ। তা লেগেচে। আঙ্গুলগুলো আর থাকবে না—ঝরে খসে যাবে। [কোণের ধারের চেয়ারটায় খুঁড়িয়ে বসে সদানন্দ] গুণতিতে পায়ের আঙ্গুল দশটাই আচে। বুল্লেন—কিন্তু সব কটা কাজ করে না। হঠাৎ হঠাৎ দু'চারটে মুলো মতো হয়ে যায়। সাড় থাকে না। ভর দিতে যাও—হোঁচট ? বাতব্যাধির যে কত লীলা, লীলাময় বাতব্যাধি !

[সুব্রত চলে যায়। ফোনটা তোলে সদানন্দ]

হেলো ঃ বোধহয় ছেড়ে দিয়েচে। হেলো—নাঃ হেলো হেলো···কোথায় ? এত দেরী করে ফেললাম। তেল মাকচিলাম। ফেলুর ছোটটা আব্দার ধরলে—পিঠটায় তেলটা ডলেদি. তারপর যাও জেঠু ! সে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামছি—আমাদের কাজের মেয়েটার হাতটা গায়ে ঠেকলো। ললিতা, আমার ওয়াইফ···গঙ্গাজলের বোতল নিয়ে এল······গায়ে ছিটোল···দুগ্‌গা দুগ্‌গা করে বেরোলাম। ঝক্কি কি একরকম সংসারে হেলো··· কে টুনি ? বাবাকে বল, আমি এসে গেচি। হ্যাঁ ধরে আচি···(পায়ের আঙ্গুলটা টিপে) লেগেচে মন্দ না।

কল্যাণ। রক্ত পড়চে নাকি ?

সদানন্দ। না, রক্ত জমে আচে।

কল্যাণ। দাও, একটু চা দাও ওঁকে।

শুভা। এমন ভাবে বলছ, যেন চা ওর হোঁচট লাগার ওষুধ।

কল্যাণ। তাহলে আয়োডিন দাও।

শুভা। চা-ও দেবো. আয়োডিনও দেবো।

সদানন্দ। হ্যাঁ, দুটো দ্রব্য মিশিয়ে খাবো। কিচ্ছু চাই না। এক্ষুণি অফিস যেতে হবে। কারখানায় আবার ষ্ট্রাইক চলছে, এঁকে বেঁকে ঢুকে পড়তে হবে। গুটি দশেক প্রাণী নিয়ে ঘরকন্যা। একমুঠো একমুঠো করে দিলেও তো দশমুঠো যোগাতে হবে এই একখানা হাতে। মালিকের চোখে যতক্ষণ আছি, হাতের কলমটি নৌকার হালের মতো দরিয়া পার করে দেবে। হেলো···আসেনি !

শুভা। (কল্যাণকে) ঠিক আছে, তুমি ভেতরে এস, ওঁকে শান্তিতে ফোনটা করতে দাও।

সদানন্দ। না, না, তাতে কি আছে, তেমন প্রাইভেট কিছু নয়। এক্ষুণি হয়ে যাবে। আপনাকে উঠতে হবে না, কল্যাণবাবু। হেলো, কে সীতানাথ ?

[কল্যাণ খবরের কাগজে চোখ রাখে। শুভা চলে যায়]

হ্যাঁ আমি বলছি···সদানন্দ—গলাটাও ভুলে গেলে ? হ্যাঁ-হ্যাঁ (হাসে) কালকে বললাম কথাটা ভুলে গেলে ? তা মাথার চুল উঠছে বলে কি ওর সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্মরণশক্তিও উবে যাচ্ছে।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ তোমার ক্যানসার আর টাকের কোন ওষুধ নেই হে। টাকের চিকিৎসা থাকলে তো অষ্টম এডোয়ার্ডের মাথায় থোকা থোকা চুল গজাত। এইখানে তোমার পয়সাও অচল—দু-খানা বাড়ি নিয়েও জব্দ হয়ে গেলে এখানে বাবা ক্লাসলেস সোসাইটি। (হাসতে থাকে) তা ভালো কথা, মনিময়ের খবর কি ? ও তা বলছিলাম ললিতাকে, ঐ জন্যই ফোন করছিলে ? আচ্চা, আচ্চা (হুঁ-হুঁ করে করে বললে) পরশু ? পরশু পাকা দেখা ? আরে ললিতা যাবে না ! বলা মাত্রই না সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে। তাহলে ওরা জামাইকে বাইরে পাঠাচ্চে ? দেয়া-থোয়া ? এক মেয়ে ? ছেলে নেই ? বাগিয়েচে ভাল ? (কল্যাণের দিকে তাকিয়ে) ঠিক আচে, রেখে দিচ্চি। এখন গপ্পের সময় ? অফিস ধত্তে পারবো না গো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আচে। রাখচি। টুনিকে পাঠিয়ে দিওনা একবারটি··· আচ্চা···আচ্চা···হে হে হে·· আচ্চা। (ফোনটা রেখে দেয় কল্যাণের দিকে তাকিয়ে) খানিকটা সময় জ্বালাতন করলুম।

কল্যাণ। না, না, তাতে কি আছে। বাবা আর কিছু না হোক ফোনটা রেখে গেছেন বলে তবু যাহোক আপনাদের মতো দু-চারজন প্রতিবেশীর পায়ের ধুলো পড়ে। মানে একটা যোগাযোগের সুযোগ হয় আর কি ?

সদানন্দ। তা ঠিক। বিপদে-আপদে এক এক সময়···নিজে তো আর ফোন রাখতে পারবো না কোনো কালে।

[শুভা চা নিয়ে আসে]

কল্যাণ। চা খান।

সদানন্দ। এই ত্যাখো। আমি তো উঠছিলাম। অফিস টাইমে আবার হাঁড়ি নামিয়ে কেটলি চাপালে। এরপর দেখছি আর আসতে পারবো না।

শুভা। চা করতে আর কতক্ষণ লাগে।

[পেয়ালাটা হাতে নেয়। হঠাৎ কাগজের তৈরী বড় একটা বাজপাখি নিয়ে ভয় পাইয়ে দেবার মতো শব্দ করে সুব্রত ঢোকে। সকলে চমকে ওঠে।]

শুভা। দেখেছ, তোমার ভাইটির কাণ্ড দেখলে! যা চমকে উঠেছি না।

কল্যাণ। দানোর মতো ওটা কি একটা নিয়ে ঢুকলি! এভাবে কেউ ঘরে ঢোকে? কে আছে না আছে দেখবি তো।

সদানন্দ। তাতে কি, ছেলেমানুষ! (শুভাকে) একচামচে দুধ যদি থাকে, মানে হঠাৎ কাপটা চলকে গিয়ে ধুতিটা···

শুভা। দাঁড়ান, আমি আনছি। (সুব্রতকে) যা অসভ্য হয়েছ না!

[শুভা চলে যায়]

কল্যাণ। ওটা কি?

সুব্রত। বাজপাখি।

কল্যাণ। তা ওটা এঘরে কি ওড়াবে বলে নিয়ে এলে?

সুব্রত। বৌদিকে ভয় দেখাব বলে।

সদানন্দ। বৌদিতো ভয়ে মারা যাচ্ছিলেন। একটু সইয়ে সইয়ে ভয় দেখালে হয় না? প্রথমেই কড়া ডোজ।

কল্যাণ। পড়াশুনা তো ছেড়ে দিয়েছ। এখন পাখি নিয়ে খেলছ। কোত্থেকে ওটি জোটালে?

[শুভা ঢোকে। সদানন্দ কাপড়ে দুধ লাগায়।]

শুভা। জোটাবে কি—বানিয়েছে। দুদিন ধরেতো এই করছে! বানিয়েছে কিন্তু বেশ! গুণ ছিল, বুঝলেন—দলে পড়ে না, মাথাটি গোল্লায় দিচ্ছে! এইতো এলো বলে সব দলবল, ফ্ল্যাগ ফেষ্টুন কাঁধে করে চলল সব দেশোদ্ধার করতে।

শুভা। আমি তো খালি পোষ্টার এঁকে দি।

সদানন্দ। এই কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত, বুঝলে না।

সুব্রত। আজকে মিটিং এর ডায়াসে এটা রাখা হবে। টেবিলে রেখে যাচ্ছি।

কল্যাণ। কেন?

সুব্রত। ছোড়দা বলেছে, ভেঙ্গে দেবে।

শুভা। কেন, ভাঙবে কেন?

সুব্রত। ওর পকেট থেকে পয়সা নিয়েছি।

কল্যাণ। আমার, আমার পাঞ্জাবীটা কোথায়?

সুব্রত। তোমার পকেট থেকে অল্প নিয়েছি।

কল্যাণ। কেন, একটা পকেটে মন ভরল না?

সুব্রত। ভাগভাগ করে নিলুম। কারুর গায়ে লাগল না।

কল্যাণ। ঠিক আছে, তুই বেরো।

[সুব্রত বাজপাখিটা টেবিলে রেখে চলে যায়]

সদানন্দ। বেশ হিসেবী হয়েছে ভাইটি।

সুব্রত। (ভেতর থেকে) বৌদি।

শুভা। যাই। বাজার এসে গেছে। শোন, তোমার জল গরম করে রাখছি, স্নান করতে যাবার আগে নিয়ে যেও। ঠাণ্ডা বাসি জল আবার গায়ে লাগিও না।

[শুভা চলে যায়]

সদানন্দ। বৌদি পেয়েছেন মনের মতো। দেখিতো, মাঝে মধ্যে ছুটিতে বেরোন—কে বলবে দশটি বছর সংসারের জোয়াল বইছেন। যেন কনে বউটিকে নিয়ে চাঁদের আলো কুড়াতে যাচ্ছেন।

কল্যাণ। দূর থেকে সবই সুন্দর, বুঝলেন কিনা—সেই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস—

সদানন্দ। অয়েলক্লথ, আমূল দুধ কিনতে কিনতেই মাথার চুল দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। (বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে) ঐ বাজপাখিটার মতো কোন শত্তুরে যেন সব ঝাঁপিয়ে

পড়ে ঠুকরে নিচ্ছে। কি আর আছে। আহার, নিদ্রা, প্রজনন— চলছে এই তিন চাকার গাড়ি! এক এক সময় রুখে উঠতে ইচ্ছে করে···যাকগে চলুক ছ্যাকড়া-গাড়ি, তিন চাকায় চেপে ধুকতে ধুকতে এগোন যাক। চলি, আপনারও তো বেরুবার টাইম হয়ে আসছে। উঠি। (উঠে পড়ে একটু হেসে বলে) মালিকের তোষামোদ কচ্চি বটে কিন্তু এখনো আইডিয়ালিজম্ আছে, মরবার সময় সিরাজদৌল্লার মতো বলে যাব, ভাই সব সুখে থাকো। (জোরে হাসে। যেতে যেতে) বাজপাখি এতক্ষণ আমাকে দেখছিল, এবার কিন্তু আপনি একা, মুখটা ঘুরিয়ে নিন। চলি

[সদানন্দ চলে যায়। কল্যাণ একদৃষ্টে বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে কাছে যায়। পাশের দরজার কাছে পবিত্র। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ওকে লক্ষ্য করে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে। পায়ের শব্দে কল্যাণ কিছুটা চমকে ওঠে।]

কল্যাণ। ও, তুই!

পবিত্র। ঝুঁকে পড়ে পাখিটায় অত কি দেখছিলে?

কল্যাণ। চোখদুটো কি জ্বলজ্বলে দেখেছিস্ (মুখটা কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে) যেন কিছু নজরে পড়েছে, লোভে ঠোঁটটা চকচক করছে···

পবিত্র। সুব্রতকে বখশিশ্ দিও, ওর শিল্পের এত বড় সার্টিফিকেট কেবল প্রশংসায় মিটিয়ে দেয়া তোমার ঠিক হবে না, দাদা।

কল্যাণ। তা নয়, সদানন্দবাবু বলছিলেন—

[হঠাৎ ধক করে কথাটা যেন ভেতরটায় কোথায় লেগে গেল]

পবিত্র। ভদ্রলোক একটু কথা পাগল আছে।

কল্যাণ। হবে।

পবিত্র। অফিস যাবে তো?

[কাগজটা দেখতে থাকে পবিত্র]

কল্যাণ। দেরী আছে এখনো। গোটা দুনিয়ার উপর বাজপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে এখানটা খুবলে নিচ্ছে, ওখানটা ছিঁড়ছে। আমরা আর কি করবো—খবরের কাগজ পড়ছি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছি। তোরা ডাক্তার ছেলেরা তো কিসব নিয়ে আন্দোলন করছিস ?

পবিত্র। করছে ওরা সব দলবল মিলে।

কল্যাণ। সমর্থন থাকলেও তো আর সময় দেয়া যায় না। তোমার পড়া হয়েছে কাগজটা ?

কল্যাণ। হ্যাঁ, নিয়ে যা।

[পবিত্র কাগজটা নিয়ে চলে যাবার আগে দেখে কল্যাণ সেই বাজপাখিটার দিকে আবার তাকিয়ে আছে। পবিত্র চলে যায়। ফোনটা বাজতে থাকে, ধরে না কল্যাণ। শুভা ঢোকে।]

শুভা। ঘরের মধ্যে জ্বলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছ, অথচ ফোনটা ধরতে পারছ না ?

[ফোনটা ধরে শুভা।]

শুভা। হ্যালো ··হ্যালো···।

কল্যাণ। দ্যাখো তো, রীণা বোধ হয়।

শুভা। রঙ্ নাম্বার। (ফোন রেখে দেয়) হঠাৎ রীণা ফোন করছে, তোমার মনে হল যে ?

কল্যাণ। না, ঐ পবিত্রদের হাসপাতালে মেয়েটা রাজনীতির বেশ বড় পাণ্ডা—ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতাম···ও হয়তো—

শুভা। সে নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামানোর কি হোলো ? পবিত্রর বন্ধু, তা বলে পবিত্রই ওর ওসব কচকচিয়ে তেমন আমল দেয় না। হ্যাঁ, এই পাখিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কল্যাণ। না ওটা থাক।

শুভা। না, থাকবে না, তুমি নাকি হাঁ করে কেবল ওটা দেখছিলে ? তোমার তো ঢং এরও শেষ নেই, অলক্ষুণে ব্যাধিরও শেষ নেই। সেবার কালীমূর্তির দিকে তাকাতে তাকাতে মা কালী তোমাকে ভর করল। সুব্রতকে ডাকছি, ও এসে নিয়ে যাক। সুব্রত, সুব্রত।

[সুব্রত ঢোকে।]

সুব্রত। কি বলছ ?

শুভা। এটা নিয়ে যা।

সুব্রত। কেন কি হয়েছে ?

কল্যাণ। আহা থাক না। এক এক সময় তোমরা এমন ক্ষেপে ওঠো !

শুভা। না নিয়ে গেলে আমি কিন্তু ঠিক ভেঙ্গে ফেলবো।

সুব্রত। ওটা ভাঙ্গলে ওরা আমার মাথা ভেঙে ফেলবে না ! আজকের মিটিংএ এটা মঞ্চের পাশে রাখা হবে বুঝলে ? নীচে লেটারিং করে দেব 'শত্রুকে চিনুন'।

শুভা। বুঝলুম, তুমি নিয়ে যাও।

কল্যাণ। যা আরম্ভ করেছ না। তুই যা, যখন দরকার নিয়ে যাবি।

শুভা। বস্তুটি কি যার ওপর তোমার এখন ওর থেকেও দরদ বেশি ! মনে হচ্ছে ঐ বাজপাখিটার সঙ্গে পূর্বজন্মে কোন সম্পর্ক ছিল তোমার।

সুব্রত। দাঁড়াও, লেটারিং শেষ করে এসে নিয়ে যাচ্ছি।

[সুব্রত চলে যায়।]

কল্যাণ। জানো শুভা, কাগজে বানানো একটা পাখি। ওটার আর কিইবা দাম। বাচ্চা ছেলেও নই যে খেলনা ভেবে নেচে উঠব। কিন্তু এক একটা তুচ্ছ জিনিষ হঠাৎ এমন জোরে নাড়িয়ে দেয় যা আমি ভাবতে পারতুম অথচ ভাবিনি, সেসব মনে পড়ে।

শুভা। এ বয়সে আর নতুন করে নাড়া খেয়ে কাজ নেই। বেশ আবোল তাবোল বকে যাচ্ছ—এবার চান করতে যাবে তো যাও।

কল্যাণ। যাই। (শুভা টেবিলটা গোছায়) লাইব্রেরী থেকে একটা বই এনে রেখেছিলুম টেবিলে তোমার জন্য।

শুভা। ওঘরে নিয়ে গেছি।

কল্যাণ। পড়েছ ?

শুভা। দুপুর ছাড়া পড়তে পারি ?

কল্যাণ। আগে তুমি হাপুস-হুপুস করে পড়তে।

শুভা। আগের দিন কি আর আছে ? সেই তুমি আছ, না আমি আছি ?

কল্যাণ। কোথায় যায় ?

শুভা। ঘ্যানর ঘ্যানর থামাও তো !

কল্যাণ। তুমি আজ বাড়ীর বড় বউ। অন্তত একটা পোষ্ট পেয়ে গেছ। মায়ের জায়গাটা তুমি নিয়ে নিয়েছ। আমি বাবার মত হতে পারলুম কৈ ?

শুভা। অকর্মা লোকদের তোমার মতই দশা হয়।

কল্যাণ। পয়সা করতে চাইলে বাবা তা পারতেন। পয়সার বদলে বাবা চাইলেন দেশের মুক্তি। ইংরাজের-গুলি খেয়ে পা-টা গেল। কিন্তু সেই খোঁড়া মানুষটা ছিলেন পাহাড়ের মত অটল। আর আমি একটা ক্লীব।

শুভা। এ বয়সে আর নতুন করে কি করবে ?

কল্যাণ। বয়স আর কতটা নেয়, আরো একটা শত্তুর আছে। রোজ একটু একটু করে খুঁটে খুঁটে খায়।

শুভা। খাচ্ছে খাক না, ফুরিয়েতো যায়নি।

কল্যাণ। (মুখে নিষ্প্রভ হাসি) কি জানি !

শুভা। বাবা ছিলেন অন্যমানুষ। সেরকম আর ক'জন হয় ?

কল্যাণ। সদানন্দ বাবু বলেছিলেন, এক একদিন রুখে উঠতে ইচ্ছে করে।

শুভা। রুখে ওঠো। সে সব মানুষ আলাদা।

কল্যাণ। বদল তো হয়।

শুভা। দ্যাখো, সব সময় সব কিছু ভালো লাগে না। কি আরম্ভ করেছ বলতো? সব আমাকে শুনতে হবে? খবরের কাগজে কোথায় যুদ্ধ বেঁধেছে দেখলে, আমার সামনে চেঁচাতে শুরু করলে! কোথায় গুলি চললো—পারলে তার বারুদের গন্ধ শোঁকাতে চাও। কোথায় কি হোল না হোল তার অত খবরে আমারকি দরকার! (জামাটা পাট করে রাখে। টুকিটাকি কাজের মধ্যে বসে) হ্যাঁ, বুঝতুম তুমি একটা নেতা-পাণ্ডা হয়েছ, দু-দশ জায়গায় সভা করে বেড়াচ্ছ, রাজ্যের অশান্তির কথা কাগজ পত্রে লিখছ,—তবে মানায়। চড়ুই খোলের মতো ঘরে বসে থাকো দশটা মানুষের মধ্যে গেলে মিনমিন করো—বাড়িতে বসে তর্জন গর্জন আর হা-হুতাশ কত ভালো লাগে বলোতো? (কল্যাণের দিকে তাকিয়ে)—কি ঝিম্ মেরে বসে রইলে কেন? অফিস যেতে হবে না?

কল্যাণ। তুমি যাও, যাচ্ছি।

শুভা। যেতে তো আমাকে হবেই। অফিস কামাই করলেও তো আর উনুন কামাই যাবে না। ভালো চাকরিতে জুতেছ।

কল্যাণ। আমি কিছু পারি, মানে এখনো পারি—তোমার বিশ্বাস হয়?

শুভা। কি পারো?

কল্যাণ। অনেক কিছু।

শুভা। অনেক কিছুটা কি?

কল্যাণ। আবার আগের মতো ফূর্তিতে থাকতে পারি। ভাবতে পারি ঘর সংসার ছাড়াও আরো কিছু করা যায়।

শুভা। হ্যাঁ, যায়। একটা কমণ্ডলু আর চিমটে হাতে নিয়ে গায়ে ছাই ভস্ম মাখা যায়।

কল্যাণ। তুমি জানো, এতবড় পৃথিবীটায় একটা যুদ্ধের মীমাংসার জন্য একটু বসবার জায়গা পর্যন্ত কেউ ছেড়ে দিতে সহজে রাজী হয় না।

শুভা। কেন, তোমার এতবড় ঘরখানা আছে দিয়ে দাও। তোমার খাতিরে না হয় দশকাপ চা করে খাওয়াব।

কল্যাণ। তুমি জানো তোমার আমার মতো দশভাগের ন'ভাগ মানুষ সবকিছু জেনেশুনে চুপ করে আছে। ন'ভাগ শক্তি মোটে কাজেই লাগছে না।

শুভা। আচ্ছা জ্বালাতনে পড়লুম তো ? তোমার কানে কি আমার কোনো কথাই যাচ্ছে না। ছ্যাখো, যদি পারো কিছু করো, আমাকে জ্বালিও না।

কল্যাণ। (কেমন দীপ্ত দেখায়) আমি ঠিক কিছু করব।

শুভ। করবে তো কর, আমাকে বলে কি হবে ?

কল্যাণ। কাগজ পড়ি আর কতো কথা মনে হয়। তোমরা কেউ শুনতে চাও না কিন্তু কাউকে আমার বলতে ইচ্ছে করে। যদি এই ফোনটা তুলে মনের মতো একজন মানুষ ওধারে পাই —

শুভা। মনের মানুষ ?

কল্যাণ। হ্যাঁ, গোটা পৃথিবীর কষ্টে যার মনটা কাঁদে, চোখ ছুটো রাগে জ্বলে, আর ছুটো হাত শূন্যে তুলে ঐ বাজপাখি-গুলোর ডানা ছিঁড়ে ফেলতে চায়—

শুভা। তুমি যে বক্তৃতা দিতে শুরু করলে ? এতো যে পারে, কে সেই মানুষটা ?

কল্যাণ। তোমার নেতা ; আমার নেতা ; যাদের ক্ষোভ আছে, কষ্ট আছে তাদের নেতা।

শুভা। তোমার মতো মানুষকে সে পুছতে যাবে কোন্ ছুঃখে ?

কল্যাণ। আমার ছুঃখ আছে বলেই তো পুছবে।

শুভা। তোমার কি জ্বরটর আসছে ?

কল্যাণ। কেন ?

শুভা। গায়ে জ্বর উঠলে তোমার তো আবোল তাবোল বকবকানি শুরু হয়ে যায়।

কল্যাণ। ঠাট্টা করছো ?

শুভা। ঠাট্টা করার কি আছে !

কল্যাণ। আমি ঠিক কিছু করব।

শুভা। তাই কর। ডালটা ধরে গেল।

[শুভা বিরক্ত মুখে চলে যায়। মুহূর্তকাল বাজপাখিটার দিকে কল্যাণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে। মঞ্চে অনৈসর্গিক আলো ঘন হতে থাকে। ফোনটার কাছে যায়। মঞ্চের আলোর রঙ তীব্র হয়। ডায়াল করে। ভিতরের কোনো উত্তেজনায় ওকে কিছুটা অস্থির মনে হয়। ফোন তোলে। অস্থিরতায় আচ্ছন্ন গলায় কল্যাণ ফোনে কথা বলে। কষ্ট এবং উত্তেজনা ওর কণ্ঠস্বরে]

কল্যাণ। হ্যাঁ, আমি। আমি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, পিতা ঈশ্বর চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিঃসন্তান। পেশা কেরানি। না, কোন সাধ নেই। সামর্থ্য নেই। আমার স্ত্রীকেও পুরো সুখী করতে পারি নি। পৃথিবীর কাউকেই আমি সুখী করতে পারিনি। (কান্নার মতো শোনায়) কাউকে পারিনি। আমি কল্যাণ, পিতা ঈশ্বর চন্দ্রনাথ। নিঃসন্তান। পেশা কেরানি এই পৃথিবীতে বাস করি, কোনো সাধ নেই, সামর্থ্য নেই। হ্যালো—হ্যালো পৃথিবীর কাউকেই আমি সুখী করতে পারিনি। হ্যালো হ্যালো—ওঁকে আমার চাই। দয়া করে ওঁকে একবার দিন। অতদূরে ! ট্রাঙ্কল—ট্রাঙ্কল হয় না ? ওঁকে আমার চাই। কতদিন, কতদিন ধরে চাইছি ! আপনাদের প্রিয় নেতা। পৃথিবীর প্রিয় নেতা। এই বাজপাখিটা যাকে ভয় পায় —আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবো। পৃথিবীর অতি নগণ্য একজন মানুষ, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে একজন মহান নেতার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। হয়তো প্রথম এরকম একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মুখোমুখি কথা

বলবো—আমি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। সাধ আছে, হয়তো সামর্থ্যও আছে যে তার স্ত্রীকে সুখী করতে চায়—। পৃথিবীর অন্তত একজনকেও সুখী করতে চায়। হ্যালো, ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে? কি বলছেন? একটু বাদে কানেকশন্ হবে, আপনি জানাবেন? ঠিক আছে, রেখে দিচ্ছি।

[ফোনটা রেখে দেয়। কল্যাণকে ভীষণ খুশী দেখায়। ব্যাকুলভাবে শুভা বন্ধ দরজার কড়া নাড়তে থাকে। ওর গলা শোনা যাও—"দরজা বন্ধ করলে কেন? খোলো, খোলো বলছি।" সুব্রতর গলা—"দাদা, এই দাদা?" পবিত্রর গলা—"দাদা? দরজা ভাঙতেই হবে।" কল্যাণের সমস্ত মুখটা উপভোগের হাসিতে ছেলেমানুষের মতো দেখায়। জোরে দরজায় একটা ধাক্কা পড়তেই দ্রুত খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের আলো বদলে আগের মতো হয়ে যায়।] (ওরা ঘরে ঢোকে)

শুভা। (শঙ্কিত) দরজা বন্ধ করেছিলে কেন?

সুব্রত। কথা পর্যন্ত বলছ না!

পবিত্র। ঠিক দরজা ভাঙতে হোত এক্ষুণি। অন্তত সাড়া দেবে তো?

শুভা। কি হয়েছে কি? একটু লজ্জা করে না তোমার! বাড়ীসুদ্ধু লোককে ভাবিয়ে মজা পাচ্ছ? কি ঢুকেছে আজ সকাল থেকে তোমার মাথায়?

কল্যাণ। বলছিলে না, অন্তত একটা কিছু কর।

শুভা। হ্যাঁ, বেশ ভালোরকম একটা রসিকতাই করলে!

কল্যাণ। আমি যা করেছি, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কেউ তা করেনি; শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

সুব্রত। কি করেছ?

কল্যাণ। বলব কি না ভাবছি।

শুভ। সে বলো আর নাই বলো। সুস্থ শরীরে তোমাকে দেখতে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এত সব অলক্ষুণে দুর্ভাবনা হচ্ছিল; সত্যি তুমি এমন না!

পবিত্র। বৌদি, দাদা নিশ্চয়ই একটা মজার কিছু করেছে। দেখছ না, হাসি-হাসি মুখ।

শুভা। মুখ দেখেতো মনে হচ্ছে, এই বল না, ব্যাপারটা বল না।

সুব্রত। বলে দিলেই তো ফাঁস হয়ে যাবে। তাই বলছে না।

শুভা। তাহলে তোমার মজা নিয়ে তুমি থাক। তোমরা চলে এস তো।

কল্যাণ। ধরো, যদি এই পৃথিবীর কোনো মহান নেতা যিনি আমাদের এই দেশের থেকে ঢের ঢের দূরে। তার সঙ্গে আমি এক্ষুণি কথা বলি?

শুভা। তোমাকে যেমন দেখে গেছি, এখন দেখছি মাথাটা আরো বিগড়েছে। আগে তবু কথাবার্তার একটা মানে বুঝছিলাম—কি বলছ সব?

পবিত্র। বৌদি দাদাকে বলতে দাও। ও যা বলতে চায়, বলতে দাও।

সুব্রত। সেই যে কালী, মহাদেব—ওরা ভর করলে দাদা যেরকম কথা বলত—তেমনি বলছে।

শুভা। কি সর্বনাশ! ওঝা বদ্যি না আবার ডাকতে হয়।

কল্যাণ। সর্বনাশের কিছু হয় নি। সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচেছি। তোমরা কেউ জানো না, আজ কত বড় একটা শুভ দিন। আমি—একটু বাদেই এই পৃথিবীর একজন মহান নেতার সঙ্গে—

সুব্রত। নামটাতো বলবে?

পবিত্র। এ সময় বাধা দিস না। যা বলতে চায় বলতে দে।

শুভা। তুমি বলো, বুঝলে তুমি যা বলতে চাও বলো।

কল্যাণ। তোমরা এমন করছ যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আরে আমি ঠিক আছি, পুরো ঠিক—অনেকদিন পর ভীষণ ভালো লাগছে আমার।

শুভা। ঠিক আছে, তোমার যা বলতে ইচ্ছে করছে বলো।

কল্যাণ। বললুম তো আমি পৃথিবীর একজন প্রিয় নেতার সঙ্গে কথা বলবো। এটা যে কত বড় সৌভাগ্য তোমরা ভাবতে পারবে না। একটু আগেও আমি ভাবিনি।

পবিত্র। তিনি কি আসবেন ?

কল্যাণ। না।

সুব্রত। তাহলে তুমি কথা বলবে কি করে ?

কল্যাণ। কি করে কথা বলি সেটাই তোরা দেখবি। এই ঘরে, এখানে, তোদের সকলের চোখের সামনে এই বাজপাখিটার শত্রু, পৃথিবীর এক স্মরণীয় নেতার সঙ্গে কথা বলবো।

শুভা। (পবিত্রকে) তুমি তো ডাক্তার, কি মনে হচ্ছে ? কাউকে ডাকবে ? যা'কে ভালো বোঝ, তেমন কোন ডাক্তারকে বরঞ্চ ডাকো।

কল্যাণ। কি আশ্চর্য সেই থেকে ব্যাপারটাকে অসুখ ভেবে যাচ্ছো। একশবার বলছি, বাপুরে আমার কিচ্ছু হয়নি। কিচ্ছু না।

শুভা। মায়ের মুখে শুনিনি, যখন তোমার উপর মহাদেবের ভর হয়েছিল, তখনো তো তুমি বলতে কিছু হয়নি। হঠাৎ হঠাৎ ছাতাটা, লাঠিটাকে ত্রিশূলের মতো ধরে হঠাৎ মহাদেব হয়ে যেতে। এসব তো তারই লক্ষণ। কি করি এখন ? একটার পর একটা অশান্তি।

পবিত্র। বৌদি অত আপসেট হয়ে পড়লে তো চলবে না। আমাকে বুঝতে দাও। আচ্ছা দাদা, তুমি নিজে কি কোন নেতা হয়ে গেছ ? মানে এরকম ভাবছ ?

কল্যাণ। আরে এরা কি ! যা বলছি, এতক্ষণ ধরে সেটা মাথায় ঢুকছে না ! বলছি, একজন নেতার সঙ্গে কথা বলব ?

শুভা। (চেঁচিয়ে) কিভাবে বলবে সেটাতো বলবে ? কোন্ নেতা সেটাতো বুঝবো !

কল্যাণ। এত কৌতূহল না তোমাদের ! কেন, একটু কাল ধৈর্য ধরতে পারো না। একটু চেপে রাখার আনন্দও পেতে দেবে না ?

সুব্রত। কোন একটা মজার প্ল্যান নিশ্চয়ই দাদার মাথায় ঘুরছে। আমার মনে হয় প্ল্যানচেট বসাবে। আর মিডিয়ম একজন প্রেতাত্মার গলায় কথা বলবে। কাল খেতে বসে প্ল্যানচেটের গল্প বলছিল না দাদা?

কল্যাণ। তোমার মুণ্ডু!

শুভা। মুণ্ডু কি? লাইব্রেরী থেকে 'মরণের পরপারে' বইটা আনোনি?

কল্যাণ। আরে ওসব কিছু না।

পবিত্র। কিছুটা কি বলতে কি আছে? তোমারও তেমনি গোঁ!

কল্যাণ। ঐ যে ফোনটা দেখছ ঐ ফোনে কথা বলব। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। ট্রাঙ্ককলে যার সঙ্গে কথা বলা প্রায় অসম্ভব সেই বিরাট মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলবো। হোলো?

শুভা। এতই যখন বললে, দয়া করে নামটা বলো।

কল্যাণ। দয়া করে একটু বিশ্বাস করে আমাকে একটু সুস্থ থাকতে দাও। ফোনটা যে কোনো সময়—হয়তো এক্ষুণি বেজে উঠবে তোমরা সব জানতে পারবে।

পবিত্র। সত্য বলছো?

কল্যাণ। কিভাবে আমি বোঝাবো, বল? আমার মধ্যে কোন লক্ষণ দেখছিস্ পাগলামোর?

সুব্রত। দাদা যখন এত করে বলছে—

শুভা। বোধহয় ও ঠিকই বলছে।

সুব্রত। তাহলে ভেবেছ, বৌদি? আমাদের বাড়িতে এক্ষুনি একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাবে!

শুভা। কাগজে উঠবে না?

পবিত্র। ব্যাপারটা ঠিক হলে—

শুভা। ঠিক হলে কি, ওতো বলছেই সব ঠিক। তোমাদের ডাক্তারদের বাবু সব তাতে সন্দেহটা একটু বেশি।

পবিত্র। না আমি বলছিলাম, তাহলে কাগজে ওর ছবিও ছাপবে। এরকম ঘটনা সত্যিই তো কোথাও ঘটে নি।

কল্যাণ। আরে ছবিটাই বড় হলো! আগে ফোনটা বাজুক।

শুভা। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।

[সুব্রত দৌড়ে চলে যায়।]

কল্যাণ। দেখলে, ও নিশ্চয়ই ঢাক পিটিয়ে খবরটা ছড়াতে চলল।

পবিত্র। দু-চার জনের থাকা ভালোই, সাক্ষী থাকা ভাল—আমাদেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না, তারপরে তো বাইরের লোক। দাঁড়াও আমিও আসছি। সেনবাবুকে একটা খবর দি। কাগজের লোক, খবরটা ওদের পাওয়া দরকার।

শুভা। বাড়ি আছে?

পবিত্র। না থাকলে, অফিসে ফোন করব? [চলে যায়]

শুভা। এই এখনতো কেউ নেই, আমাকে নামটা বলো। বলো না? কেউ তো নেই।

কল্যাণ। কেন ওরা কি আমার পর নাকি; বললে ওদের সামনেই বলতাম।

শুভা। বেশ তাহলে আর একটা কথাতো অন্তত রাখবে?

কল্যাণ। কি?

শুভা। ওদের সামনে বললে ঠিক মুখ টিপে টিপে হাসতো। জামা কাপড়টা বদলে তুমি একটু সেজে নাও।

কল্যাণ। ঘরে বসে কথা বলব এতে সাজবার কি আছে?

শুভা। সেনবাবু দেখো ঠিক ছবি তুলবে। তাছাড়া পাঁচজন লোকতো ঘরে আসবে।

কল্যাণ। যা আছি বেশ আছি—আমার ওসব ভাববার সময় নেই, ভিতরে কি রকম একটা একসাইট্‌মেন্ট হচ্ছে। তুমি ভাবতে পারবে না!

শুভা। রাজনীতি তো বিশ্বসুদ্ধ লোক করছে, তোমার মতো ভাগ্য ক'জনের হয় বলোতো? আমাকে তো যাচ্ছেতাই করে

বলো, কিন্তু বেশ পয়া আছি, সেটা তোমাকে এবার বলতেই হবে। তাই না?

কল্যাণ। হবে।

শুভা। হবে কি? আমার সঙ্গেও এখন ভারিক্কি চালে কথা শুরু করেছ। আমিই তো তোমাকে বলেছিলুম কিছু একটা করো—ওরকম খেপিয়ে না দিলে, এসব ঘটতো?

কল্যাণ। এক সময় আমি ক্ষেপে উঠতামই।

শুভা। তবু তুমি আমাকে একটু দাম দেবে না!

কল্যাণ। তোমাকে আমি চিরকাল দাম দি।

শুভা। না বাপু, অনেক ঝগড়া করেছি, এখন আর কিচ্ছুটি বলব না তোমাকে। একটু সরবৎ খাবে?

কল্যাণ। এই তো চা খেলাম।

শুভা। চা-তো গরম! ঠাণ্ডামতো কিছু? পাকা পেঁপে আছে খাবে?

[সদানন্দবাবু আর সুব্রত ঢোকে]

সদানন্দ। সুব্রত যা বলল, সত্যিই তাই নাকি, কল্যাণবাবু?

কল্যাণ। ও ঠিকই বলেছে।

সদানন্দ। মশাই, আমাদের পাড়াটারই ইজ্জত বাড়িয়ে দিলেন। পাড়া বলছি কেন, দেশটারই সম্মান বেড়ে গেল।

[সেনবাবু ক্যামেরা কাঁধে হন্তদন্তভাবে পবিত্রর সঙ্গে ঢোকে]

সেনবাবু। এখনো ফোনটা বাজেনি তো? আমিতো প্রায় বেরুচ্ছিলাম। সবই লাক্—একবার বেরিয়ে পড়লেই হয়েছিল। এসব খবর রীতিমত দুর্লভ জিনিষ! গোটা পৃথিবীতে সেল করা যাবে। সত্যি, হুট করে একটা গ্লোরিয়াস কেস্ বাঁধিয়ে ফেললেন না!

পবিত্র। রীণাকে একটা ফোন করবো?

শুভা। না, এখন কেউ ফোনে হাত দেবে না।

[হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে, সকলে চমকে ওঠে। কল্যাণ দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরে।]

কল্যাণ। হ্যালো, হ্যাঁ আমি। (মুখটা বিমর্ষ) না, শুভা এখানে নেই।

শুভা। কি বলছ ? আমি তো আছি।

কল্যাণ। তোমার মা। পরে জানিও তুমি আছ। এখন ফোন আটকে রাখতে পারব না।

[ফোন রেখে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন। কল্যাণ দৌড়ে যায়।]

কল্যাণ। (ফোনটা ধরে) না, সদানন্দবাবু নেই।

সদানন্দ। আমি মানে—

কল্যাণ। থামুন. আপনি নেই।

শুভা। ফোনটা রেখে বল, শুনতে পাচ্ছেন না ?

কল্যাণ। বলছিতো, সদানন্দবাবুকে পাবেন না। হোঁচট খেয়ে শয্যাশায়ী। (কল্যাণ ফোনটা রেখে দেয়) এরপর ফোন এলে তোমরা ধোরো, আমার শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে ! আমি অবশ হয়ে যাচ্ছি, কিরকম একটা হচ্ছে !

সদানন্দ। তাতো হবেই একটা এক্‌সাইটমেন্ট চলছে, তার উপর—

সেনবাবু। সময় হয়ে এল বোধ হয় ? কতক্ষণে ফোন পাবেন সেরকম কিছু জানিয়েছে ?

কল্যাণ। না। তবে পাব। ঠিক পাব। (সদানন্দ ওঠে) আবার উঠছেন কেন ? দয়া করে এখন ফোন করতে যাবেন না।

সদানন্দ। না, তা না। থুথুটা ফেলে আসচি। কৃমি আছে তো। ঘন ঘন থুথু আসে।

কল্যাণ। চুপ করে বসে থুথু গিলতে থাকুন।

পবিত্র। তুমি ওঘরে গিয়ে একটু বসবে ?

কল্যাণ। এখান থেকে আমি যাব না।

সুব্রত। তুমি কথাওতো বলে যাচ্ছ সেই থেকে, একটু চুপ করে থাক না, ভাল লাগবে।

শুভা। কিছু একটা হলেই সেই বকর বকর—কথা বলার কম ক্লান্তি।

কল্যাণ। উপদেশ না দিয়ে তোমরা একটু চুপ কর।

[সবাই একটু কাল চুপ করে থাকে]

সদানন্দ। আপনি—

[সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যায়]

কল্যাণ। না, কথা বলুন, সবাই চুপ করে থাকলে কি রকম ভুতূড়ে লাগে।

শুভা। সত্যি, এসময় একটু কথা না বলে কেউ পারে—

সদানন্দ। আমি বলছিলুম, আপনি এমনিতে ভালোমানুষ, কিছুটি বোঝার উপায় নেই, তলায় তলায় রাজনীতির চিন্তাটি বেশ চালিয়ে গেছেন, না হলে মাথায় এরকম বুদ্ধি আসে।

পবিত্র। দাদা একটু আগে আমাদের ইউনিয়নের খবর নিচ্ছিল। মাথায় সবসময় এসব ঘোরে।

সুব্রত। আমাদের মিটিং-এ প্রায়ই দাদা হাজির হয়ে যায়··· আজকে তো···

শুভা। দিন রাততো ঐ এক কথা—একটা ঘর সংসারের কথা বলার সুযোগ পাই না। একটু আগেই তো একটা মোটা বই নিয়ে পড়ছিল। একটা ইংরেজীতে লেখা রাজনীতির বই। হাত থেকে কেড়ে নিতে হোলো, ঐ নিয়েই মুখ গুঁজে পড়ে থাকতো—অফিস যাওয়া ওখানেই শেষ!

কল্যাণ। শুভা!

শুভা। আজকের দিনটায় ধমকিও নাতো। যা খুশি বলব।

সদানন্দ। যখনই ফোন করতে আসি দেখি চোখের সামনে কাগজ ধরে আছেন। কাগজ ছাড়া আর কিছুতে ওর খেয়াল নেই।

সেনবাবু। আরে মশাই, ঐ কাগজই তো সব কিছুতে খেয়াল এনে দেয়।

কল্যাণ। আপনাদের কথাবার্তা কিছুই আমার কানে ঢুকছে না।

সদানন্দ। শুধু একটা ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং—হচ্ছে তো?

[কল্যাণ তাকায়। সদানন্দ নিথর]

সেনবাবু। দাঁড়ান, এই উৎকণ্ঠার মুহূর্তের একটা ছবি তুলে রাখি।

সদানন্দ। উৎকণ্ঠা ?

[সদানন্দ মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব আনবার চেষ্টা করে। শুভা সুব্রত চোখ তাকাতাকি করে। সেনবাবু প্রস্তুত হয়। শুভা কল্যাণের চেয়ারের পিছনে ছিল]

সদানন্দ। (শুভাকে) মা লক্ষ্মী ! (শুভা তাকায়) একটু এদিক পানে আসুনতো মা মনি ! (শুভা সরে আসতে ওর জায়গা দখল করে নেয়) কেমন দুষ্টুমি করে জায়গাটা নিলুম ! (শুভা রকম দেখে জ্বলে যায়) আমি প্রবীন পেছনে, নবীন বসে আছে মাঝখানে পদতলে—(সুব্রতকে দেখিয়ে) কিশোর। আর কোলে—(দরজার কাছে একজনকে) হ্যাঁরে ফেলুর ছোট্টটাকে একবারটি নে আয়না···কিশোরের কোলে থাকবে বাল্য। ক্লাসিক !

শুভা। (বিরক্ত) আর আমরা ?

সদানন্দ। কেন চেয়ারের দুপাশে হাতল নেই ? হাতল ছুয়ে থাকবে ভ্রাতা-পত্নী !

[ওরা দুজনে দুপাশে দাঁড়ায়—দরজার পাশে দু-একজনকে উদ্দেশ্য করে সদানন্দ বলে—]

সদানন্দ। আয়। ঘিরে থাক। ছবি উঠছে—কাগজে। ফেলুর ছোট্টটার কি হলরে ? হাঁক পার না একটা !

সেনবাবু। এখন ছেড়ে দিন।······(সবাই এসে ঘিরে ধরে) বৌদিকে দেখতে পাচ্ছি না।

শুভা। জায়গা পাচ্ছি না তো।

সদানন্দ। জায়গা করে নিন।

শুভা। কি করে করব—সবতো আঁকড়ে আছে !

সদানন্দ। এখন কি বিবাদের সময় !

সেনবাবু। বৌদি, আপনি এগিয়ে ওঁর মুখের কাছে ঝুঁকে যেন কিছু বলছেন, যান।

শুভা। (কল্যাণের কাছাকাছি গিয়ে) কি বলব আবার ?

সেনবাবু। কিছু একটা বলুন, তাহলে ছবিতে অ্যাকশন্ আসবে।

সদানন্দ। আমরা।

[সবাই মিলে কল্যাণকে ঘিরে ধরে ওকে প্রায় আড়াল করে ফেলে। বিড়বিড় করে শুভো অ্যাকশন দেয়।]

কল্যাণ। সরো সরো সব। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[সবাই সরে যায়]

কল্যাণ। উঃ পাগল করে ছাড়বে সব।

সেনবাবু। আচ্ছা, কল্যাণবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। যে মহান নেতার সঙ্গে কথা বলবেন, তাকে আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন ?

[নোট বই আর পেন্সিল বার করে।]

কল্যাণ। কি জিজ্ঞেস করবো মানে ? কিছু একটা জিজ্ঞেস করবো—

সেনবাবু। আচ্ছা, হঠাৎ আপনার এই ফোনে যোগাযোগের ব্যাপার কি করে মাথায় এল ?

পবিত্র। এ বাজপাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দাদা কি রকম অন্যরকম হয়ে যেতে থাকে।

[সেনবাবু নোট নিতে থাকে]

সদানন্দ। পাখিটা আমার চোখেও কেমন লেগেছিল।

কল্যাণ। যে নেতার সঙ্গে আমি কথা বলব, তিনি ঐ বাজপাখিটার শত্রু। মানুষের অধিকারের ওপর যেখানেই বর্বর লোভ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে তাঁর সমস্ত শক্তি রুখে দাঁড়ায়। মানুষ এই সুন্দর পৃথিবীটায় সুন্দরভাবে বাঁচবে। এর থেকে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না।

সুব্রত। দাদার কথা বলা কেমন সুন্দর হয়ে যাচ্ছে।—যেন মিটিং।

সেনবাবু। যে মহান নেতার সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁর সঙ্গে আপনি কি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবেন ?

সদানন্দ। হ্যাঁ, তাঁকে তো আর কেমন আছেন—এটা জিজ্ঞেস করার অর্থ হয় না।

পবিত্র। হাজার হাজার মাইল দূরের একটা মানুষ—

সদানন্দ। হাজার মাইল দূরের নয়, আমাদের মনের খুব কাছের মানুষ।

পবিত্র। এখানে এরকম একজন মহান মানুষ। যিনি পৃথিবীর শুভাশুভ নিয়ে ব্যস্ত। তাঁকে সত্যি করেই তাঁর যোগ্য প্রশ্ন করা উচিত। তুমি নিশ্চয়ই কিছু জানতে চাইবে? সেই প্রশ্নটা সেজন্যই যথেষ্ট বিবেচনা করে বলা দরকার।

সদানন্দ। আপনি নিশ্চয়ই এ-বিষয় ভেবেছেন?

শুভা। না ভেবে কি ও এতদূর এগিয়েছে।

সুব্রত। সমস্ত মানুষের হয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

সেনবাবু। সমস্ত মানুষের হয়ে, কি প্রশ্ন? কল্যাণবাবু, কি প্রশ্ন করবেন আপনি?

কল্যাণ। (অসহায়) আমি সেরকম কিছু ভাবিনি। আমি অত জানি না। মানে বিশ্বাস করুন, আমার সে যোগ্যতা নেই।

সদানন্দ। তাহলে আপনি কি তাঁর কাছ থেকে নিজের কিংবা দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু জানতে চান?

কল্যাণ। কি জানতে চাইব?

শুভা। কি আশ্চর্য, সেটাইতো তোমাকে ভেবে বের করতে হবে।

কল্যাণ। বিশ্বাস কর, জানতে চাইতে হলে নিজেকে অনেক কিছু জানতে হয়! নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। আমি শুধু সংসার করে গেছি—কী ভীষণ ফাঁকি দিয়েছি! নিজেকে ফাঁকি দিয়েছি, নিজের চারদিকটাকে ফাঁকি দিয়েছি। আমি কি জানতে চাইব?

সুব্রত। তুমি আমাদের দেশের কথা বল। তার ভিতরকার সমস্যাটা জানাও যা অতদূব থেকে উনি সব জানেন না।

কল্যাণ। (আরো অসহায় দেখায় ওর মুখ) দেশটাকে যে আমি ভালো করে দেখিনি। কি অদ্ভুত! এত বছর ধরে দুচোখ

মেলে আমি কি দেখলাম? কত ক্ষত চারিদিকে, অথচ আর কাউকে তা আমি চিনিয়ে দিতে পারছি না। কোথায় যেন একটা সুতো ছেঁড়া, আমার যোগ নেই। মানুষের ব্যথা সারাতে চেষ্টা না করলে বোধহয় ব্যথাকে চেনা যায় না। আমি চিনতে এগিয়ে আসিনি! আমি অপরকে চেনাব কেমন করে?

শুভা। তাহলে এক্ষুণি ওঁর সঙ্গে কি কথা বলবে?

কল্যাণ। আমি পারব না। তুমি বল? তোমারও তো কথা আছে? তোমারও তো অভিযোগ আছে। দেশটা তো তোমারও।

শুভা। আমি কিছু জানি না।

কল্যাণ। কেন, কেন জানো না? তুমি হাঁটোনি এই মাটিতে? চোখ মেলে চলনি? চলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটেছে না? সেটা কিসের কাঁটা, কেন ফুটল, কোত্থেকে এল, জানবে না তুমি—কেবল ঠকবে?

শুভা। তুমি কেন জান না? কেবল আমার দোষ! রান্নাঘরটা ছাড়া আমি আর কোথায় গেছি? কি দেখেছি? ধোঁয়া, কালি, হাঁড়ি-কলসী আর হেঁচকে টানা সংসার—আর কি জানি?

কল্যাণ। কাউকে কিছু বলতেই হবে। সদানন্দবাবু। তাহলে আপনি বলবেন?

সদানন্দ। আমি?

কল্যাণ। হ্যাঁ, আপনি একজন বিরাট মানুষের মুখোমুখি না হলে বোঝা যায় না—আমার কি জানা উচিত, করা উচিত। কি আমার দায়িত্ব। এখন সেই সময় আমার এসেছে—আপনি বলবেন?

সদানন্দ। আমাকে ক্ষমা করুন। মানে আমি—আপিসের ইউনিয়-নের চোখে আমি বিষ···মালিকের পায়ে তেল ঢেলে

সংসার ধরে রেখেছি—আমার কি বলা মানায়? মন চায় রুখে উঠি। পারলে, তখন বলব।

কল্যাণ। সেনবাবুও বোধহয় বলবেন না? কেউ বলবেন না। আমাদের নেতা ডেকে ডেকে ফিরে যাবেন?

সেনবাবু। খবর সংগ্রহ করি—কিন্তু আমারও তো মালিক আছে। আসলে খবর কুড়োতে কুড়োতে কোথায় কিভাবে যেন নিজেকে বেচে দিয়েছি। মানে, কি রকম নষ্ট হয়ে গেছি —নিজের খবরটা যোগাড় করতেও তো সময় নেয়। এক্ষুণি বলতে পারবো না। সময় পেলে—

পবিত্র। আমাকে বলতে বোলো না দাদা! আমি কি বলব? স্টুডেন্ট লাইফে কেবল স্টুডেন্টই থাকতে চেয়েছি—নিজের শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু তেমন করে জানতেই চাইনি।

সুব্রত। কিছুদিন পর আমি ঠিক বলতে পারব। আর একটু বুঝলে, আর একটু তৈরী হলে।

কল্যাণ। (অন্যদের) আপনারা? (ওরা চুপ) আমাদের এই ছোট ঘরটায় আমরা কেউ আমাদের মহান নেতার সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে পারলুম না। তাই বলে তাঁকে ডেকে চুপ করে থাকবই বা কেমন করে? আজ না পেরে যদি কাল পারি, বা পরশু—তাহলে সেদিন তার সঙ্গে কথা বলব। গেট এভরিবডি রেডি=আমরা আমাদের মহান নেতার সঙ্গে কথা বলবই। যে আগে আসবে সেই আগে কথা বলবে। তোমরা একটু বাইরে যাও। আমি জানিয়ে দি।

[সকলে সন্তর্পণে বাইরে যায়। সেই রহস্যময় আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। কল্যাণ ফোনটা তুলে দাঁড়ায়]

কল্যাণ। হ্যালো, হ্যালো—আমরা কয়েকজন নিতান্ত গৃহস্থ মানুষ আমাদের মহান নেতার সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে পারলাম না। দয়া করে আমাদের একটুখানি সময় দিন। আমরা

পারবো। এই মুহূর্তে না হলেও আমরা পারবো—কাল না হয় তার পরের দিন।······

ভাঙ্গাচোরা, অথচ অন্ধ, গৃহস্থ কয়েকটি মানুষের প্রার্থনা—দয়া করে একটুখানি সময় দিন। কাল না হয় পরশু—আমরা পারবো, হ্যাঁ, হ্যাঁ বাজপাখিটা আমাদের চোখের সামনেই তাকিয়ে আছে···চোখবুজেও আমরা দেখতে পাই—পৃথিবীর আকাশে যে বাজপাখিটা ভয়ংকর ডানা মেলে ওড়ে সেটা ছোট্ট সংসারের মধ্যেও ওঁৎ পেতে বসে থাকে। চোখে ক্ষুধা, নখে লোভ, ঠোঁটে হিংসা, সোজা তাকিয়ে আছে।

শুনুন, শুনুন—

পাখিটা আমাদের ভিতরে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করছে। একটা আশ্চর্য পরিবর্তনের চেহারা দেখে ভয় পাচ্ছে···হ্যাঁ ভয় পাচ্ছে! আমরা চোখ মেলে আগের চেয়ে বেশি দেখছি···আমরা পায়ের নীচে মাটিটা আরো শক্ত টের পাচ্ছি···আমরা মুঠোর মধ্যে আরো জোর পাচ্ছি···আমাদের রক্তের মধ্যে এক নতুন শব্দ···যেন সমুদ্রের গর্জন···শুনুন···শুনুন···শুনুন ঐ সমুদ্রের শব্দ···

[কল্যাণ বুকে চেপে ধরে ফোন।···সহস্র কণ্ঠের কল্লোলের মতো ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে।

পর্দা

সোনার চাবি

চরিত্র ঃ—নন্দিতা, গৌতম, সোমেন্দু, নন্দ

[একটা বন্দুকের শব্দে পর্দা উঠল। ঘর প্রায় অন্ধকার।
কেউ নেই। বাইরে কড়া নড়ে উঠল; দ্রুত তীব্র।]

নন্দিতা। (দরজার বাইরে থেকে দ্রুত কড়া নাড়ে) গৌতমবাবু, গৌতমবাবু! দরজাটা খুলুন। নন্দ, আছো?

[একজন বৃদ্ধ চাকর পুরণো আমলের চিমনির লন্ঠন হাতে দরজা খুলে দিল। রুমালে মুখটা মুছল। জানালা দিয়ে উদ্বিগ্ন তাকিয়ে কিছু খুঁজল। হঠাৎ আবার বন্দুকের শব্দ হতে নন্দিতা একটু চমকে উঠে নন্দর দিকে বিস্মিত তাকায়]।

নন্দিতা। গুলির শব্দ কেন, নন্দ?

[নন্দ কোন কথা না বলে আলোটা টেবিলে সন্তর্পণে রেখে শিখাটা বাড়ায়।]

গৌতমবাবু বন্দুক নিয়ে বাগানে বুঝি?

নন্দ। তাছাড়া আবার কে? ছোটবাবুর মাথাটা গেছে, দিদিমণি। এই জঙ্গলের দুষ্ট আত্মা ঘুরে বেড়ায়, ওর হাওয়া লেগেছে ছোটবাবুর গায়ে।

নন্দিতা। বাগানে বন্দুক নিয়ে কি করছেন?

নন্দ। কি আর করবে! আকাশ তাক করে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে, গুচ্ছের ছাইপাস গিলেছে তো! বুঝলে দিদিমণি, মানুষটা এই ভুতুড়ে বাড়ির ভিটেয় একদিন মরে পড়ে থাকবে নিজের বাড়ি ঘরে আর ফেরা হবে না। কারুর কথা কি শোনে। তুমি এসেছ, বলিগে।

[নন্দ চলে যাচ্ছিল।]

নন্দিতা। নন্দ, শোন—এক্ষুনি ডাকতে হবে না ওকে। আমি একা এখানে একটু বসছি। (নন্দ চলে যেতে থাকে) নন্দ,

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখত একজন প্যান্ট সার্ট পরা ভদ্রলোক উঠোনের গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কি না ?

নন্দ। (জানালা দিয়ে তাকিয়ে) হ্যাঁ, কাঁধে একটা ফটো তোলার বাক্স। এদিকে তাকিয়ে আছে আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।

নন্দিতা। আচ্ছা, তুমি যাও নন্দ।

নন্দ। দিদিমণি, লোকটা কে গো ?

নন্দিতা। চিনি না। কয়েকদিন ধরে এখানকার জঙ্গলে ঘুরতে দেখছি। কত রকম লোক আসে এখানে। ঠিক আছে, তুমি যাও নন্দ।

[নন্দ চলে গেলে নন্দিতা সন্তর্পণে জানলা দিয়ে আবার তাকাল। ভিতরের দরজা দিয়ে গৌতম ঢুকল। হাতে বন্দুক। মুখে দাড়ি, প্যান্ট সার্ট মলিন। নন্দিতাকে দেখেনি এখনো। বন্দুকটা টেবিলে রাখল। পকেট থেকে একটা মদের বোতল বের করে শব্দ করে টেবিলে গড়িয়ে দেয়। শব্দ শুনে নন্দিতা ফিরে তাকায়। মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হয়।]

গৌতম। (আপন মনে) "I would, if I could—
If I could not, how could I ?"

নন্দিতা। (তীক্ষ্ণ গলায়) গৌতমবাবু !

গৌতম। (দ্রুত ফিরে তাকায়। টেবিলটা পিঠ দিয়ে যথাসম্ভব আড়াল করে) নন্দিতাদেবী, আপনি ?

নন্দিতা। নেশার ঘোরেও চিনতে পারছেন দেখছি !

গৌতম। নেশা মরে এতক্ষণে ভূত, আর ভূত মরে……

নন্দিতা। আপনি নন্দকে একবার ডাকুন, ওকে সঙ্গে নিয়ে হস্টেলে ফিরে যাব।

গৌতম। এই তো এলেন, এক্ষুণি চলে যাবেন ? নন্দকে বলছি, চা করবে একটু।

নন্দিতা। চা খেয়েই বেরিয়েছি।

গৌতম। আপনার গলা শুনে কিন্তু যে কেউ মনে করবে, আপনি চটেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি আসবেন জানলে আমি এসব ছুতাম না। জানেন নন্দিতা দেবী, একটা জ্বলজ্বলে চমৎকার তারা বন্দুক ছুড়ে মাটিতে নামাতে চাইছিলাম। কেন জানেন? আপনি যখন কাল ভোর বেলা আসতেন ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করতাম। আপনি টিকলি ক'রে সিঁথির ওপর পরতেন, আগেকার কালে মায়েরা পরত। আপনাকে দারুণ দেখাত, আপনি দেখতে এত ভাল—আমাদের গ্রামের বাড়িতে বাসন্তী পূজো হতো, সেই চৈত্র মাসের বাসন্তীর মতো।

নন্দিতা। গ্রাম ভাল লাগে আপনার, দেশের গ্রাম ?

গৌতম। ভীষণ ভালো লাগে, আপনাকে যেমন লাগে সেরকম।

নন্দিতা। তাহলে তো কতটা ভাল লাগে বেশ বুঝতে পারছি। এখানে এরকম পাগলামো না করে দেশ থেকে ঘুরে আসুন। মাথায় যে পোকাগুলো ঢুকেছে মায়ের ধমক খেয়ে সব পালাবে।

গৌতম। আমার মা খুব ভাল।

নন্দিতা। বাড়ি গিয়ে মাকে একবার দেখে আসুন, মনটা অনেক ভালো হয়ে যাবে।

গৌতম। কিন্তু এখন আমি কি করে যাব, সম্ভব নয়। এই বাড়িটা ডাইনীর মন্ত্রপড়া জালের মতো আমাকে জড়িয়ে আছে। এর প্রত্যেকটা ইঁট, কাঠ আমাকে একা পেলেই ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'গৌতম, গৌতম—সোনার চাবিটা আছে তো?' সেই বুড়ো জঙ্গল সর্দারের আত্মা মহুয়ার রসে টলতে টলতে এসে বলে, 'সোনার চাবিটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলিস না, বেনারজী বাবু! আছে, আছে!'... কিন্তু কি আছে? কোথায় আছে? আমি কি করে জানব? চাবিটা প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাকে মারছে! ঐ চাবিটা আপনি নেবেন? আমি বেঁচে যাই! আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে দিতে চাই না, নেবেন?

নন্দিতা। নিজের বিপদটা বেশ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন, কেমন? চাবিটাকে একেবারে ভুলে যেতে পারেন না? এই পোড়ো বাড়িটার মেঝে, দেয়াল, সবতো খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষেত বানিয়ে তুলেছেন! কোথায় আর হীরে জহরতের বাক্স লুকোনো থাকবে? আর থাকলেই বা, কী হবে ও সবে?

গৌতম। সম্পদের আমার তেমন লোভ নেই, নন্দিতা দেবী। কিন্তু রহস্য, একটা অজানা বাক্স, তার ভিতরে কি আছে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। একটা চাবি, কেবল একটা চাবি, নিয়ে অপেক্ষা করা যে কি ভয়ংকর! আমি কিছু একটা খুলতে চাই, বিস্ময়ে অবাক হতে চাই, একটা অদ্ভুত ঐশ্বর্য দু-হাতে মুঠো করে এক মুহূর্ত অন্তত সম্রাটের মতো উল্লাসে চিৎকার করে উঠতে চাই। না-হলে ঐ চাবিটা সারাজীবন আমাকে জ্বালাবে যে।

নন্দিতা। অ্যাদ্দিন তো কিছুই পেলেন না, খোঁজের তো বাকি রাখেননি কিছু। চাবিটা আসলে জঙ্গল সর্দারের মনগড়া কল্পনা এরকমও তো হতে পারে।

গৌতম। মরবার সময়, বুড়ো সর্দার এই ঘরে বসে কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে চাবিটা আমাকে দিল; বলল,—'আছে, আছে-- একটা নক্সা করা বাক্স।' জিজ্ঞেস করলুম, 'ভিতরে কি?' 'কিছু না', বলে হাসল। আবার বলল, 'আছে।' সবাই বুড়োকে পাগল বলত, কিন্তু আমি ওর চোখ দেখেছি, গলার স্বর শুনেছি, বুকের ভিতরের স্পন্দন শুনেছি—ও মিথ্যা বলেনি, মিথ্যে ও জানে না।

[নন্দিতা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।]

গৌতম। কি দেখছেন? গরম লাগছে বুঝি? দেখুন নন্দর কাণ্ড,

দরজা বন্ধ করে রেখেছে। হাওয়াতো আর চোর নয় যে ঢুকলেই ভয়।

[দরজা খুলে গেল।]

নন্দিতা। দরজা বন্ধ থাক।

গৌতম। কেন গরম লাগছে না?

নন্দিতা। না।

গৌতম। অথচ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার গরম লাগছে, অস্বস্তি হচ্ছে।

নন্দিতা। কিচ্ছু হচ্ছে না, আপনি চুপ করে বসুন। চারপাশে জনপ্রাণী নেই, এই ভূতুড়ে বাড়িটায় আপনি কি করে থাকেন? ছেড়ে দিন।

গৌতম। অসম্ভব। কোয়ার্টার ছেড়ে আমি এখানে উঠে এসেছি। জঙ্গল সর্দারের এই ভাঙা বাড়িটা ছেড়ে আমি নড়ব না। আমি শেষ পর্যন্ত দেখব। ঐ বাক্সটা আমার চাই। আর যদি কোনদিন না পাই, চাবিটা এখানকার নদীর জলে ফেলে দেব। জঙ্গল সর্দারের আত্মা বনের মধ্যে আর্তনাদ করে কাঁদবে। আমি একটা প্রতিশোধের আনন্দ পাব।

নন্দিতা। আপনি বুঝতে পারছেন না, প্রতিশোধটা হয়ত আপনি নিজের উপরই নিচ্ছেন।

গৌতম। কিন্তু আমার সমস্ত রক্ত যেন টের পায়, এখানে কোথাও কোন অন্ধকারে বাক্সটা লুকিয়ে আছে।

নন্দিতা। আসলে একটা বানানো অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই আপনি ভালবাসেন। ঠিক আছে, উঠি আজ।

গৌতম। উঠবেন? এলোমেলো কথা বলে কেবল বিরক্ত করে যাচ্ছি আপনাকে তাই না?

নন্দিতা। কথা বলা তো আপনার স্বভাব, বিরক্ত হব কেন? হস্টেলে ফিরতে তো হবে! জঙ্গলের পথ, তার উপর রাত্তির— আমি না হয়ে মণিকা হলে ভেবেই শেষ হয়ে যেত।

গৌতম। পৌঁছে দেব আপনাকে ?

নন্দিতা। না, নন্দই তো যাচ্ছে। এমনিতেই আপনার এখানে আসি তাতে বিচিত্র ব্যাখ্যা হয়, তার উপর আপনার সঙ্গে ফিরলে তো কথাই নেই। মণিকা আলাদা, এত ভাল —আমাকে ঠিক বোঝে। আলাপ করিয়ে দেব একদিন আপনার সঙ্গে।

গৌতম। কি দরকার ; বেশ আছি একা।

নন্দিতা। আপনার এই বিশ্রী স্বভাবের জন্য স্কুলের দিদিমণিরা কি নাম দিয়েছে জানেন ? কাঠবিড়ালি। মানুষ দেখলেই গাছপালার মধ্যে ঢুকে যান। আলাপ পরিচয় করে থাকতে ভাল লাগে না আপনার ? আমি তো পারি না, মাঝে মাঝে এখানে এসে গল্প করে যাই, হয়ত আপনার খারাপ লাগে তবু।

গৌতম। আমার অনেক কিছু ভাল লাগে না, কিন্তু কেন জানি না, আপনাকে বেশ ভাল লাগে। (নন্দ ঢুকল)

নন্দিতা। এ তো নন্দ এসেছে, চলি।

নন্দ। চল, দিদিমণি।

[নন্দ এগিয়ে দরজা খুলে উঠোনের দিকে বেরিয়ে গেল।]

গৌতম। (অল্প হেসে, বালকের মতো) সাবধানে যাবেন, এই জঙ্গলে একটা রাক্ষস আসে।

নন্দিতা। (চিন্তিত মুখে) রাক্ষস ? আপনি কি কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো একজন অদ্ভুত লোকের কথা বলছেন ?

গৌতম। না, সে রাক্ষসের ক্যামেরা নেই। এমন কি স্পষ্ট মুখ নেই, চোখ নেই, পা, হৃদয়—কিছুই নেই। তবু আস্তে আস্তে গিলে খায়।

নন্দিতা। (হেসে) ধাঁধাঁ বলছেন না তো !

গৌতম। হবেও বা, অরণ্যের ধাঁধাঁ। রাক্ষসটা আর কেউ নয়, অন্ধকার। আমি রোজ দেখি, সন্ধ্যার পর রাক্ষসটা

গুটি-গুটি জঙ্গলে নেমে আসে। ধীরে ধীরে ফুলের রঙ, লতা মাটির উপর ছড়ানোছিটানো আলো—সব আস্তে আস্তে পাতা, গিলে খেতে থাকে। কেবল সবুজ রঙটা গিলতে পারে না. অন্ধকারেও সবুজ চেনা যায়, আর শাদা। আপনি যখন চলে যাবেন আপনার মুখের নরম সাদা আলো, আর ভিতরের সবুজ এই রাক্ষসটা দাঁতে ছুঁতে পারবে না। আমি জানলা দিয়ে আপনার চলে যাওয়া দেখব আর রাক্ষসটার অসহায় অবস্থা দেখে মনে মনে বিপুল হেসে উঠব।

নন্দিতা। দেখবেন যেন শব্দ করে হাসবেন না। নিজেকেই পাগল মনে হবে। আর ঐ বোতলটা তুলে রেখে দিন, এক ফোঁটাও ছোঁবেন না।

গৌতম। (বোতলটা তুলে) কিছু নেই এতে, হৃদয়ের মতো ফাঁকা। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ, খানিকটা রঙিন জল শরীরের মধ্যে ঢুকে কত কাণ্ড করছে। সমস্ত কস্‌মস্‌টা বদলে যায়, শূন্যতায় কালার্ড পেইন্টিং ঝুলতে থাকে,······মনে হয় বাতাসে ভাসমান ফ্রেস্কোর অসংখ্য দৃশ্য। ভাল লাগে না।

নন্দিতা। কাজ নেই আমার ভালো লাগায়। বেশ আছি। বাতাসে ভাসমান কালার্ড পেইন্টিং আর ফ্রেস্কো ছাড়াও আমার পৃথিবীটা বাঁচে। চলি, নন্দ আমার উপর ঠিক চটে যাচ্ছে।

গৌতম। কাল আসছেন কিন্তু।

নন্দিতা। দেখব, পারলে।

[নন্দ ব্যস্ত ভাবে ঢুকলো। দরজাটা বন্ধ করে দিল।]

নন্দিতা। কি হোল ?

নন্দ। সেই লোকটা আবার আসছে। দূর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকে আসছে দেখলাম।

গৌতম। কে ? কার কথা বলছ ?

নন্দিতা। (আপন মনে) আশ্চর্য! অদ্ভুত সাহস তো!

গৌতম। কার কথা বলছেন? লোকটি কে? আপনার চেনা কেউ?

নন্দিতা। কোনকালে চিনি না। আজকেও নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, লোকটা আমার পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাই আপনার এখানে কাছাকাছি বলে চলে এসেছি। যখন এলাম তখনও লোকটা বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। সেদিন আমরা মেলায় গিয়েছিলাম; বার বার লক্ষ্য করেছি, আমাদের কিছু দূরে দূরে থেকে হাঁটতে। বাসে করে শহরে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, লোকটাও ঠিক ঐ বাসে উঠেছিল।

গৌতম। নন্দ, তুই লোকটাকে এদিকে দেখেছিস?

নন্দ। এই প্রথম দেখলুম। গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করব?

গৌতম। তোকে কিছু করতে হবে না, তুই ভিতরে যা আমি দেখছি।

নন্দিতা। আপনি যাবেন না। কি প্রকৃতির লোক কে জানে?

[নন্দ ভিতরের ঘরে চলে যায়।]

গৌতম। (বন্দুকটা নিল) সঙ্গে বন্দুক রয়েছে আমার, ভয় কি?

নন্দিতা। তাহলেও দরজা খুলবেন না, কোন বিশ্বাসই নেই এসব অদ্ভুত লোককে!

গৌতম। এত ভয় কিসের! দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি? ভিতরে ডাকি ওকে।

নন্দিতা। আসলে ওকে দেখলে আমার কেমন ভয় করে। পরশু একটা কাণ্ড হয়েছিল। ঘুমের মধ্যে আমি অনেক সময় নিজের অজান্তে হাঁটি। সেদিন শান্তা রাত জেগে পরীক্ষার খাতা দেখছিল, আমি ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। শান্তা ভাবতেই পারেনি আমি ঘুমের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছি, ভাবল ঘরের মধ্যে গরম তাই বুঝি বাইরে যাচ্ছি। তারপর আমাকে হঠাৎ সোজা রাস্তার দিকে হাঁটতে দেখে

দৌড়ে গিয়ে ধরে আনল। আমি যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকের রাস্তার মোড়ে নাকি ঐ লোকটা দাঁড়িয়েছিল। শান্তা বলল, সোজা আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলে আমার কেমন ভয় করে।

গৌতম। লোকটির নিশ্চিত কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা জানা ভাল। লোকটার এই অদ্ভুত ঘোরাফেরার অর্থটা জানা দরকার। আপনার স্বার্থেই ওকে আমার ডেকে কথা বলা দরকার। আমি দরজাটা খুলছি, আপনি বরঞ্চ ভিতরে যান।

[দরজা খুলতে গেল।]

নন্দিতা। আপনি যাবেন না, আমার অনুরোধ।

[হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে থেকে একটা গলা—'দরজাটা একটু খুলুন।']

নন্দিতা। খুলবেন না। একটা কিছু মতলব নিয়ে এসেছে।

[বাইরে থেকে—'মিঃ ব্যানার্জি আছেন ? গৌতম ব্যানার্জি ?]

গৌতম। আমি খুলছি। কোন ভয় নেই আপনার।

[বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে দরজাটা খুলে দিল। একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ম দর্শন, দীর্ঘ চোখের তরুণ ঢুকল। কাঁধে ক্যামেরা, মুখে সিগ্রেট। একজন টুরিস্টের মত দেখতে। গৌতমের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভ হাসল।]

লোকটি। বন্দুকটা রাখুন। ওটা অহেতুক এত উৎকট শব্দ করে। (তুজনের দিকে নমস্কারের হাত ঘুরিয়ে) নমস্কার, নমস্কার।

[ওরা প্রতি নমস্কার জানাল হাত তুলে।]

লোকটি। আপনিই তো ফরেস্ট অফিসার গৌতম ব্যানার্জি ? আমি সোমেন্দু, সোমেন্দু চক্রবর্ত্তী। আপনারা কেন জানি না, বেশ অভিভূত, বসতেও বলছেন না। বসছি, কেমন ? (বসে) বসে পড়লুম কিন্তু।

গৌতম। আপনাকে ঠিক চিনতে পারলুম না

সোমেন্দু। এবার চিনবেন। আপনাকে আমি চিনি, এখানকার

লোক আপনাকে সম্প্রতি পাগলা বাবু বলছে। আর নন্দিতা দেবীকে আমি তো চিনিই। ওঁর সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।

নন্দিতা। হ্যাঁ, দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা আমার পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়েছে। আপনি আমাকে সব সময় বিশ্রী ভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এমন কি আজকেও—

সোমেন্দু। অনুসরণ ব্যাপারটাই সবসময় পাপ নয়, কিংবা নোংরা নয়, নন্দিতা দেবী। কোন একটা সৎ উদ্দেশ্যও তো থাকতে পারে।

নন্দিতা। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ লুকিয়ে কারুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় না।

সোমেন্দু। তাহলে আপনার সামনে এলেই পাপের বদলে পুণ্য হত। যদি বলি, একটু আড়াল থেকে, দূর থেকে লক্ষ্য করাই আমার দরকার ছিল। একটা ছবি যেমন দূর থেকে দেখলে ভাল, এক একটা মানুষের ক্ষেত্রেও তা-ই।

গৌতম। আপনার উদ্দেশ্যটা সম্ভবত আমাদের জেনে নেয়া উচিত।

সোমেন্দু। বিলক্ষণ। এক কথায় নন্দিতা দেবী সম্পর্কে আমার একটা ইন্টারেস্ট রয়েছে এবং তা আমি নন্দিতা দেবীর আড়ালে আগে আপনার কাছে বলতে চাই।

নন্দিতা। আমার সম্পর্কে যা বলবেন, আমার সামনেই বলুন—এটাই ভদ্রতা।

গৌতম। ওঁর সামনেই বলুন।

সোমেন্দু। অসম্ভব। গৌতমবাবু, মজা কি জানেন, আপনার স্বার্থেই আমি নন্দিতা দেবীকে লক্ষ্য করে গেছি। অবশ্য আমারও একটা লোভ ছিল। একটা বিশেষ মুহূর্তে আর পরিবেশে নন্দিতা দেবীর একটা ছবি নেবার লোভ

ছিল। কিন্তু যখনই তুলতে গেছি, তক্ষুনি মনে হয়েছে এর পরেই ওকে আরো সুন্দর দেখাবে। আমি মাত্র একটাই ছবি তুলতে চেয়েছিলাম এবং সেটাই চূড়ান্ত।

নন্দিতা। কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছবি তোলা অন্যায়—এ কাণ্ডজ্ঞানটুকু নিশ্চয়ই রয়েছে আপনার?

সোমেন্দু। ছবি তুলিনি তো। তুললে আপনি জানতেও পারতেন না। চোখের আড়ালে তো কত কিছু হয়—আমরা কিছু করতে পারি না; আপনি না, আমি না—কেউ না।

গৌতম। কি করেন আপনি?

সোমেন্দু। কিছু না, প্রায়ই ঘুরে বেড়াই। নানা রকম খেলা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। এসব খেলায় কখনো টাকা আসে, কখনো নেহাত মজা—কখনো বা একটু ঘটনা বানানোর লোভ। এও এক ধরণের দর্শন নিয়ে বাঁচা, বলতে পারেন—আমি একজন দার্শনিক।

গৌতম। কিন্তু আমার এখানে কি জাতীয় দার্শনিক খেলায় আপনার আগ্রহ হল, বুঝতে পারছি না।

নন্দিতা। খেলার কিছুটা নমুনা কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।

সোমেন্দু। আমি কিন্তু নমুনাটুকুর থেকে অনেক বেশি, অনেক বড়। আমি একজন সুনিশ্চিত বিবেকবান, চতুর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুশিক্ষিত, এবং দৈবক্রমে দেখতে ভালোই বলা যায়! আমি ছবি আঁকতে ভালবাসি, গান গেয়ে সময় কাটাতে ভাল লাগে, নেহাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে সাহিত্য করি না। তাছাড়া এসবও এক ধরণের বন্ধন, ঝামেলা!

নন্দিতা। কোন একটা বিষয় নিয়ে অন্তত কিছু সাধনা চালিয়ে গেলে পারতেন! এরকম একজন পূর্ণাঙ্গ প্রতিভা, পথে ফুরিয়ে যাবে! নিজের জন্য মায়া হয় না আপনার!

সোমেন্দু। ভীষণ মায়া হয়। আমি নিজেকে ভীষণ ভালবাসি।

আমি মরে গেলে, সম্ভব হলে নিজের জন্য কাঁদতাম। আর এই কান্নাটা ভুলে থাকবার জন্য এক একটা খেলা খুঁজে বেড়াই, খেলার সঙ্গী খুঁজে বেড়াই। যেমন সম্প্রতি আপনারা।

গৌতম। আমরা!

সোমেন্দু। হ্যাঁ, আপনারা।

নন্দিতা। আপনি নিজেকে একটি প্রহেলিকা বানিয়ে এক ধরণের আনন্দ পান দেখছি।

সোমেন্দু। সব কিছুকেই কি আপনি প্রহেলিকা বলেন? গৌতমবাবু যে বাক্সটা খুঁজছেন সেটাও কি প্রহেলিকা?

গৌতম। আপনি বাক্সটার ব্যাপার জানেন?

সোমেন্দু। এটা জানাতো শক্ত নয়, এ অঞ্চলে তো এই একটাই গল্প। শুনে থেকে গেলুম—আমার ভিতরে একটা খেলা জাগল। আর মণিমুক্তোর রূপ দেখার লোভ।

গৌতম। ঠিক বলেছেন, মণিমুক্তোর রূপের মোহ, স্পর্শের মোহ, আবিষ্কারের মোহ। জানেন, এবাড়ির সব জায়গায় আলো জ্বালিয়ে রাখলেও এক টুকরো ভয়ংকর অন্ধকার চোখের আড়ালে এখানে কোথাও আছে, আর সেই অন্ধকারে বাক্সটা লুকিয়ে আছে। দেখতে না পাওয়া গেলেও আছে, যেমন একটা গাছের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফল লুকিয়ে থাকে, একটা একটা করে বোঁটায় দেখা দেয়; যেমন কোন নারীর হৃদয়ের মধ্যের প্রখর একটা অন্ধকারে ভালোবাসা লুকানো থাকে। সে রকম একটা রহস্যময় অন্ধকার এবাড়িতে কোথাও আছে, সেখানে সেই বাক্সটা বড় একা। আমি ওটা চাই, ভীষণ ভাবে চাই।

সোমেন্দু। আপনার মত আমিও চাই, আর এ ব্যাপারে নন্দিতা দেবীই আমাদের একমাত্র সহায়।

নন্দিতা। মানে?

সোমেন্দু। হ্যাঁ, ঐ মণিমুক্তোর বাক্সটা আপনার সাহায্য ছাড়া পাওয়া অসম্ভব।

গৌতম। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সোমেন্দু। আপাতত নন্দিতাদেবী যদি একটু পাশের ঘরে যান, গৌতম বাবুকে রহস্যটা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারি।

নন্দিতা। আপনাদের এসব খেলায় আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই! আমি হষ্টেলে ফিরে যাচ্ছিলাম, তাই যাব।

সোমেন্দু। কি আশ্চর্য্য! আপনি চলে গেলে একা গৌতমবাবুকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। দয়া করে কয়েক মিনিট থেকে যান।

গৌতম। নন্দিতা দেবী এসময় আপনি চলে যাবেন না। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, কয়েক মিনিট; আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। যদি সত্যি সত্যি মণিমুক্তোর বাক্সের ডালাটা খুলতে পারি। কয়েক মিনিট পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, আমার অনুরোধ!

নন্দিতা। সত্যি করেই আমাকে হস্টেলে এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে কিন্তু। অল্প একটু পরেই কিন্তু উঠব।

[নন্দিতা পাশের ঘরে চলে গেল। একটু কাল দুজনেই চুপ। সোমেন্দু সোজা গৌতমের চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ হাসল।]

সোমেন্দু। সোনার চাবিটা কোথায়?

গৌতম। আছে।

সোমেন্দু। ভাল। আমার চোখে এক রকম বিস্ময়কর আলো আছে, সব অন্ধকার ধরা পড়ে, এমন কি যে অন্ধকারে বাক্সটা তাও।

গৌতম। সত্যি বলছেন?

সোমেন্দু। মিথ্যে আমি বলি না। তবে আমার অর্ধেক, আপনার অর্ধেক। এই বাটোয়ারায় রাজি?

গৌতম। যে কোন সর্তে আমি রাজি। কেবল ওটা খুঁজে বের করুন। কিন্তু আপনি আমাকে নিয়ে কোন মজার খেলা খেলতে চাইছেন না তো !

সোমেন্দু। অহেতুক খেলা আমি খেলি না। অকারণে দৌড়ে ঘেমে উঠতে কে চায় ? নিছক মজাও আমাকে ক্লান্ত করে।

গৌতম। বাক্সটা খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই আপনি একটা প্ল্যান করেছেন, কিছু ভেবেছেন বা জানেন ?

সোমেন্দু। প্ল্যান অবশ্যই একটা রয়েছে। (সিগ্রেট ধরাল) প্রথমত নন্দিতা দেবীকে আমার চাই।

[তাকিয়ে নিঃশব্দ হাসল।]

গৌতম। কি বলছেন আপনি ? অত্যন্ত বিশ্রী শোনাচ্ছে আপনার কথা।

সোমেন্দু। এটাই আমার দুর্ভাগ্য। শুনতে বিশ্রী শোনালেও আমার বক্তব্য নিতান্তই সৎ। আমাদের প্ল্যানটায় সহযোগিতার জন্য নন্দিতা দেবীকে চাই। ব্যক্তিগত ভাবে কোন অর্থে ওঁকে দাবী করার দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া আমার ধাতে নেই। আমি ঘুরে বেড়াই। এসব আমার আসে না।

গৌতম। কিন্তু নন্দিতা দেবী আপনার উপর চটে আছেন, তাছাড়া ওঁর উপর আমার সেরকম কোন জোর করার মত দাবীও হয়ত নেই। উনি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজিই হবেন না হয়ত।

সোমেন্দু। তাহলে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই আমার। উঠি (উঠল)। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই অন্ধকারের কবর থেকে বাক্সটা তুলে আনা যেত। অন্ধকারটাই জিতল। একদিন এই অন্ধকারে আপনার চাবিটাও হারিয়ে যাবে।

গৌতম। সত্যি সত্যি যাচ্ছেন আপনি ?

সোমেন্দু। আমার আসা এবং যাওয়া দুটোই সত্যি।

গৌতম। আপনার প্ল্যানটা শুনলে, মানে যদি বিশ্বাসযোগ্য আর নিরীহ কিছু হয়, তাহলে হয়ত নন্দিতা দেবীকে বোঝাতে চেষ্টা করতে পারি।

সোমেন্দু। (এগিয়ে এসে, সোজা গৌতমের চোখের দিকে তাকাল) বেশ। আমার চোখের দিকে তাকান।

গৌতম। চোখের দিকে তাকাব মানে? চোখের দিকে তাকালে কি হয়! (হাসল) আপনি আমার মতোই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছেন, চোখের দিকে তাকালে কি হয়!

সোমেন্দু। আপনি এক দৃষ্টে আমার চোখের দিকে তাকান। চোখের মধ্যে দিয়ে যদি রহস্যময় কিছু দেখেন ধীরে ধীরে বলে যাবেন। তাকান, তাকান আমার দিকে।

[মন্ত্রবিষ্টের মত গৌতম তাকাল]

সোমেন্দু। মনোযোগ দিন। কেবল চোখের মণিটা লক্ষ্য করুন। মণিটা ক্রমশ বড় মনে হবে, যেন নীল আর উজ্জ্বল কালোতে মেশানো কাঁচের একটা বল। আর ঐ বলটার গায়ে দৃশ্য, দৃশ্যের পর দৃশ্য। দেখছেন?

গৌতম। (স্বপ্নমুগ্ধের মতো) অপূর্ব আপনার চোখ,—ঘন পল্লব, গভীর দৃষ্টি, অপলক, রহস্যময়। যেন সমুদ্রের তলার শ্বেত শংখটি আপনি দেখতে পান, যেন মাটির নীচের বীজ, বুকের তলোদেশের জলে ভেসে বেড়ানো সোনালি রূপোলি মাছ, আপনার চোখে পড়ে। আমি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, অনেক কিছু—মেঘের মত দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে—একটা অদ্ভুত গাছ, প্রত্যেকটা পাতার রং আলাদা: একটা নদী, প্রত্যেকটা ঢেউ-এর রঙ আলাদা ; নন্দিতা…নন্দিতা—ওর শরীরে জ্যোৎস্না পড়ছে, চোখ হাওয়ায় বুজে আসছে…একটা সবুজ পাতা নড়ে ওঠার শব্দ দূর থেকে বীণার মতো বেজে উঠল। কী অদ্ভুত সব দৃশ্য, শব্দ…দৃশ্য শব্দ…

সোমেন্দু। আমি যা ভেবেছিলাম আপনি তার থেকে আরো বেশি অভিভূত। যাকৃগে, আমার উপর আপনার বিশ্বাস আছে ? আমি কি রহস্যময় চোখ নিয়ে আসিনি ?

গৌতম। নিঃসন্দেহে। আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।

সোমেন্দু। মানুষ যা দেখতে চায়, আমার চোখে তা-ই ফুটে ওঠে। এ-এক বিস্ময়কর দর্পণ। এবার সেই সোনার চাবিটা বের করুন।

গৌতম। কিন্তু, কাউকে আমি এপর্যন্ত দেখাইনি। এমনকি আমার নিজেরও দেখতে ভয় করে। চাবিটা একটা গোপন অন্ধকারের ঝ'ড়ো বাতাসে আমার ভিতরটা ভীষণ নাড়াতে থাকে। বাক্সটা আমি বড় বেশি দেখি না, কাউকে দেখাইওনি।

সোমেন্দু। আমাকে দেখান দরকার। আনুন ওটা।

গৌতম। কিন্তু—

সোমেন্দু। সময় নষ্ট করবেন না, ওটা আনুন—আমার হাতে দিন।

[খুব সন্তর্পণে ড্রয়ারটা খুলে চাবিটা বের করল গৌতম। মোহাচ্ছন্নের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর এগিয়ে সোমেন্দুর হাতে দিল। খুব সাধারণ ভাবে চাবিটা দেখল সোমেন্দু, তারপর ওর দিকে এগিয়ে দিল।]

সোমেন্দু। রেখে দিন। হ্যাঁ, আপনার কাছেই রাখুন। এবার নন্দিতা দেবীকে ডাকুন।

গৌতম। এক্ষুনি ?

সোমেন্দু। এক্ষুনি। আপনি নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন না। আমার দৃষ্টিতে আশ্চর্য এক সূক্ষ্ম শক্তি রয়েছে, লোকে একে মেসমেরিজম্ বলে জানে। নিপুণ সাধনায় এই শক্তি একটা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়। আমি মানুষকে একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে যেতে পারি, স্নায়ুগুলোকে বশীভূত করতে পারি এবং ইচ্ছে

মতো মানুষের ভিতরের গোপন সত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আমি একজন মেস্‌মেরিস্ট। এর জন্য চাই সহানুভূতিশীল একজন মিডিয়ম।

গৌতম। মিডিয়ম হিসাবে কি আপনি নন্দিতা দেবীর কথা ভেবেছেন ?

সোমেন্দু। ঠিক তাই। নন্দিতা দেবী আপনার সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। তাছাড়া তিনি একজন 'সম্‌নাম্‌বুলিষ্ট' —নিশি পাওয়ার রোগ আছে ওঁর। এসব চরিত্রই ভাল মিডিয়ম হতে পারে। আমি এতদিন ধরে নন্দিতাদেবীকে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

গৌতম। উনি যদি মিডিয়ম হতে রাজী না হন ?

সোমেন্দু। আপনার খাতিরে অন্তত ওঁর রাজী হওয়া উচিত। আর একাজটাই আপনাকে করতে হবে। আমার চোখের মধ্যে মণিমুক্তোর সেই বাক্সটা খুঁজবেন। আমার চোখের ভিতরের একটা গোপন আয়নায় আমাদের দরকারী বাক্সটার ছায়া পড়বে, ঘন কুয়াশা আর অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে আবিষ্ট নন্দিতা খুঁজে বের করবেন। মিশরীয় যাদুকরেরা এ ব্যাপারে একটা ছোট্ট নীল রঙের আয়না ব্যবহার করত। আমার চোখটাই সেই আয়না। আপনি নন্দিতাদেবীকে ডাকুন।

গৌতম। সোমেন্দুবাবু, আপনি যদি একটু বাইরে যান ভাল হয়। কারণ যদি আপনি কাছে থাকেন কোনক্রমেই ওকে বোঝান যাবে না—আপনার উপর নন্দিতা দেবী এত চটে আছেন। আমি রাজি করাতে পারলেই ডাকব।

সোমেন্দু। বেশ। আমি দরজাটার কাছেই আছি। ডাকা মাত্র চলে আসব।

[সোমেন্দু চলে গেল।]

গৌতম। নন্দিতা দেবী, নন্দিতা দেবী।

[নন্দিতা এল। একটু গম্ভীর দেখতে।]

গৌতম। বিশ্রীভাবে এতক্ষণ আপনাকে পাশের ঘরে বন্দী করে রেখেছিলাম !

নন্দিতা। এবার তাহলে আমি ফিরে যেতে পারি।

গৌতম। চলে যাবেন ? নন্দিতা দেবী, একটা অনুরোধ করব ?

নন্দিতা। আমি জানি, পাশের ঘরে থাকলে এ ঘরের কথা কানে যাবেই। আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারব না, ক্ষমা করবেন। অনেক রাত হয়েছে, এখন আমাকে যেতেই হবে।

গৌতম। আ প নি, আ প নি ই আমাকে বাঁচাতে পারতেন, নন্দিতাদেবী।

নন্দিতা। আপনি যেভাবে বাঁচতে চাইছেন, সেভাবে বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান এলোমেলো হয়ে গেছে, যে যা বলছে বিশ্বাস করছেন। আপনাকে ঠকানো এত সোজা। ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি কি দেখেছেন জানি না, তবে মুহূর্তের মধ্যে একজন ঠগ লোকের বশ হয়ে গেছেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

গৌতম। ভদ্রলোক ঠগ নয়। অদ্ভূত ক্ষমতাবান লোক।

নন্দিতা। মানুষকে বি ভ্রা ন্ত করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই মঙ্গল ডেকে আনে না। আমি একজন মেসমেরিস্টকে মেসমেরিস্ট বলেই ভাবি,—এর বড় কিছু নেই তার মধ্যে।

গৌতম। কিন্তু লোকটা মেসমেরিস্টের থেকেও বড়। অন্য কিছু একটা রয়েছে ওর মধ্যে। ভদ্রলোক আশ্চর্য রহস্যময়, অনেক গোপন শক্তি রয়েছে ওর মধ্যে।

নন্দিতা। গোপন শক্তি অশুভ কিছুও হতে পারে। ওর কি উদ্দেশ্য আমরা এখনো জানি না, ওর মুখের কথা সত্য নাও হতে পারে।

গৌতম। ভ দ্র লো ক অন্তত মিথ্যেবাদী নয়। ও কেবল আপনাকে মিডিয়ম করতে চায়।

নন্দিতা। আমি শুনেছি।

গৌতম। আপনিই মিডিয়ম হয়ে সেই বাক্সটার সন্ধান বলে দিতে পারবেন।

নন্দিতা। (হেসে) আ প নি বিশ্বাস করেন এসব ?

গৌতম। কিছু একটা বিশ্বাস না করে কোন উপায় নেই আমার। নন্দিতা দেবী যে কোন উপায়ে বাক্সটা আমি খুলতে চাই। নন্দিতাদেবী, আপনি আমাকে বন্ধুর মতো দেখে'ছন, বুঝতে চেয়েছেন, উদ্ধার করতে চেয়েছেন। এ যদি সত্য হয়, এই মুহূর্তে আমাকে আপনি বাঁচাতে চাইবেন না ? বিশ্বাস করুন, ঐ চাবিটার রহস্য হয়ত আমি এক্ষুনি জানতে পারব। আমাকে জানতে দিন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক আমাকে আপনি বাক্সটা খুঁজে পেতে সাহায্য করুন। এই কুৎসিত অন্ধকার থেকে আমাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দিন। আমার অনুরোধ, আপনি রাজি হোন।

নন্দিতা। সব ব্যাপারটা যখন বুজরুকি বলে টের পাবেন আঘাতটা আরো কত বেশী লাগবে ভেবেছেন।

গৌতম। তবু এই শেষ চেষ্টা। আমার সব খোঁজা ব্যর্থ হয়েছে। খোঁজার কোন পথ পর্যন্ত আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। একটা অহেতুক চাবির ভার আমি আর সইতে পারছি না। কিছু একটা খুলতে হবে, সেটা কি ? এই প্রশ্নের যন্ত্রণা অসহ্য! আমি দিনের পর দিন কি হয়ে যাচ্ছি! কি ভয়ংকর ভাঙা-চোরা! একটা দরজা খুললে কিছু একটা হয়, অথচ দরজাটা আমি খুলতে পারি না, ভাঙতে পারি না। আজ একটা অলৌকিক বাতাসে দরজাটা যদি নড়ে উঠল, যদি আপনার আঙুল লেগে খুলে যায়—আপনি তা চাইবেন না ?

নন্দিতা। বেশ যদি আপনি খুশি হবেন ভেবে থাকেন, ওকে ডাকুন। আমি মিডিয়াম হব!

গৌতম। আপনি এত ভাল! দাঁড়ান ওকে ডাকি আগে। [চেঁচিয়ে] সোমেন্দু বাবু! সোমেন্দু বাবু!

[সোমেন্দু এল।]

সোমেন্দু। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ নন্দিতা দেবী। আপনি আলিবাবার সেই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন—পাথরের দরজা খুলে যাবে···আপনি ভয়ংকর অন্ধকারে রূপোলি আলোর প্রদীপের মতো ভেসে ভেসে সেই বাক্সটা ছুঁয়ে দেবেন—রত্ন আর রত্নের বিপুল জ্যোৎস্নায় আমাদের হৃদয় জ্বলে উঠবে।

গৌতম। রত্ন আর রত্নের বিপুল জ্যোৎস্না! একটা গোপন বাক্সে জ্যোৎস্না শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে, আমি খুলব—কি প্রচণ্ড মুক্তি!

সোমেন্দু। আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক। টেবিলটা মাঝখানে আনতে হবে। (মাঝখানে সোমেন্দু আর গৌতম টেবিলটাকে নিয়ে এল) আলোটা? (আলোটাকে অত্যন্ত মৃদু করল। নন্দিতা দেবী, আপনি আর আমি মুখোমুখি বসব। গৌতমবাবু, অন্য পাশে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে বসুন। নন্দিতা দেবী যা বলবেন, আপনি সব টুকে যাবেন। আসুন আমরা বসছি।

[ওরা যথারীতি বসল। সোমেন্দুর মেস্‌মেরাইজ করার ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর এবং পদ্ধতি একজন অভিজ্ঞ অথচ রহস্যময় হিপ্‌নটিষ্ট এর মতো মনে হবে।]

সোমেন্দু। নন্দিতা দেবী, আমার চোখের দিকে তাকান। আমার চোখের ভিতরের অলৌকিক আয়নায়। তাকান। মনে করুন, ঘুমের মধ্যে হাঁটছেন, আপনার শরীর হাল্কা হচ্ছে···এত হাল্কা যেন ইচ্ছে হলে বাতাসে আপনি ভেসে

বেড়াতে পারেন। এখন আপনি অনেক বেশী দেখতে পাচ্ছেন, অনেক নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছেন। আপনার ভিতর একটা অদ্ভুত রহস্যময় তরঙ্গ নড়ে উঠছে, আপনি একটা নতুন রকম আলোতে পথ দেখছেন, আপনার ভিতরটা আলোয় অন্ধকারে কাঁপছে। (নন্দিতাকে ক্রমশ আবিষ্ট মনে হবে) আপনি এখন ফুলের ভিতর দেখতে পান, বুকের ভিতর, গাছের ভিতরের সবুজ প্রবাহ, আকাশের অনন্ত নীলের কম্পন আপনি টের পান। তাই না? নন্দিতা দেবী, আপনি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন, তাই না? (নন্দিতা মাথা নাড়ল)

গৌতম। কি আশ্চর্য্য, আমি---

[সোমেন্দুর ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে বসল]

সোমেন্দু। নন্দিতা দেবী, আপনি কি খুঁজছেন?

নন্দিতা। (ক্লান্ত, একঘেয়ে যান্ত্রিক গলায় একটা বাক্স, কারুকার্য্য করা একটা মণিমুক্তোর বাক্স।

সোমেন্দু। বাক্সটা কোথায়?

নন্দিতা। খুঁজছি, আমি খুঁজছি।

সোমেন্দু। কোথায় খুঁজছেন? আমার চোখের দিকে তাকান, আপনি পাবেন, আপনি পাবেন।

নন্দিতা। আমি আপনার চোখের ভিতরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কুয়াশা, কেবল কুয়াশা।

সোমেন্দু। তাকান এবার, দেখতে পাবেন, তাকান; কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, তাই না?

নন্দিতা। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আমি বাক্সটা দেখতে পাচ্ছি, কি সুন্দর বাক্স!

[গৌতম উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে সোমেন্দুর ইঙ্গিতে আবার বসে পড়ল]

সোমেন্দু। বাক্সটা কোথায়?

নন্দিতা। আপনার চোখের মধ্যে এই ঘর ; এই ঘর, এই ঘরের মধ্যে ঘুরছে।

সোমেন্দু। লক্ষ্য রাখুন, বাক্সটা কোথায় যায়।

নন্দিতা। একটা মেঘ বাক্সটাকে আড়াল করছে, ঠেলছে ; আড়াল করছে, ভাসিয়ে নিতে চাইছে।

সোমেন্দু। লক্ষ্য রাখুন, বাক্সটা কোথায় যায়। ঘরের বাইরে যাচ্ছে কি ?

নন্দিতা। মেঘটা সরে যাচ্ছে ; বাক্সটা ঘরের বাইরে যাচ্ছে, হাল্কা বাতাসে ভেসে ভেসে বাইরে যাচ্ছে।

সোমেন্দু। তাকিয়ে থাকুন। বাইরে কোথায়, লক্ষ্য রাখুন—অনুসরণ করুন।

[নন্দিতাকে ভয়ংকর ক্লান্ত আর ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে]

গৌতম। ওর কষ্ট হচ্ছে। সোমেন্দু, ওর কষ্ট হচ্ছে।

সোমেন্দু। নন্দিতা দেবী, চেয়ারে মাথাটা এলিয়ে দিন। চোখ বুজুন। এবার চোখ বুজেই সব দেখতে পাবেন। (নন্দিতা ক্লান্ত মাথাটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল) বাক্সটা এবার কোথায় ? বাগানে ?

নন্দিতা। বাগানে।

সোমেন্দু। বাগানে কোথায় ? কোনো গাছে ? কোনো গাছের কাছে ?

নন্দিতা। হ্যাঁ, একটা গাছ, একটা গাছ···

সোমেন্দু। বলুন কোন গাছ ? কোন গাছ ?

নন্দিতা। একটা গাছ, একটা—(কষ্টে যেন উচ্চারণ করতে পারছে না।)

সোমেন্দু। কোন গাছ ? রক্তকরবী ? রক্তকরবী গাছের নীচে ?

নন্দিতা। রক্তকরবী গাছ, রক্তকরবী গাছের নীচে—(অতিকষ্টে কথাগুলো বলে মূর্চ্ছিতের মতো মাথাটা এলিয়ে দিল)

গৌতম। (চেঁচিয়ে) পেয়ে গেছি আমি পেয়ে গেছি ! কিন্তু নন্দিতা দেবী বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সোমেন্দু। ভয় নেই। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে আসবেন। চাবিটি এবার আমার কাছে দিন।

গৌতম। (উদ্‌ভ্রান্তের মতো) না, চাবিটা আমার কাছে থাকবে, আমি খুলব। আপনি নন্দিতা দেবীকে সুস্থ করুন। যতক্ষণ ওর চোখ বন্ধ, আমি বাক্সটা খুলব না, ওর চোখের সামনে আমি খুলব, সেই বন্দী শ্বাসরুদ্ধ জ্যোৎস্না আস্তে আস্তে কী প্রচণ্ড মুক্তিতে জ্বলে উঠবে। দাঁড়ান, আমি শাবলটা নিয়ে বাগানে যাচ্ছি।

সোমেন্দু। দাঁড়ান। আপনি এখানে ওঁর কাছে থাকুন, আমি আনব বাক্সটা।

গৌতম। (চাপা উত্তেজনায়) না ! বাক্সটা আমার, চাবিটা আমার —আমি কাউকে দেব না। আমি খুঁড়ে বের করব— আমি, আমি, আমি ! আমি প্রথম খুলব, আমি দেখব, আমি ছোঁব, আমি প্রথম উল্লাসে চিৎকার করে উঠব। আমি কাউকে ছুঁতে দেব না—না, না, না।

[পিছু সরে সরে প্রায় দেয়ালের কাছে দাঁড়ায় গৌতম]

সোমেন্দু। (শান্ত গম্ভীর গলায়) আপনি ওর কাছে থাকুন। আমি যাব। ওর কাছে এখন আপনারই থাকা উচিত। আমাকে বিশ্বাস করুন। চাবিটা আপনার কাছেই থাক, আপনিই প্রথম খুলবেন। আমি কেবল বাক্সটা এনে দেব। এটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে—আমার কাজটা পুরো করতে দিন। আমি পালাব না। বাগানতো উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, কি করে পালাব ? বরঞ্চ আপনি বন্দুকটা হাতে ধরে থাকুন—আপনার সাহস বাড়বে। আর যাই হোক, বন্দুকের সঙ্গে আমি পারব না।

গৌতম। আপনিই যাবেন তাহলে, যান। সিঁড়ির কাছে শাবলটা আছে।

সোমেন্দু। (নন্দিতার কাছে গিয়ে) নন্দিতা দেবী, আপনি তাকান

(তাকান), খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে আপনি ফিরে আসুন, খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ফিরে আসুন।

[সোমেন্দু একটু তাকিয়ে নন্দিতাকে দেখল। নন্দিতা ক্লান্ত চোখে তাকাল। মৃদু নিঃশব্দে হেসে সোমেন্দু বাগানের দিকে গেল।]

গৌতম। নন্দিতা দেবী, সেই বাক্সটার খবর আপনি এনেছেন। আপনি কতবড় একটা ব্যাপার করেছেন, জানেন না। আপনি আমার দিকে তাকান, তাকান আমার দিকে। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনাকে যে দেখতে হবে! আপনি না দেখলে আমার ভাল লাগবে না। নন্দিতা দেবী, আপনার এখন একটু ভাল লাগছে? শুনতে পাচ্ছেন, সোমেন্দু বাবু শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন—শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন? মাটির তলা থেকে ফিনকি দিয়ে জ্যোস্না উঠবে! আপনার দেখতে ইচ্ছা করে না?

[নন্দিতা ক্লান্ত ঘাড় নাড়ল।]

গৌতম। আপনি আমার হাত ধরুন, খুব আস্তে আস্তে হাঁটুন। ভালো লাগবে, সুস্থ লাগবে। [হাত ধরে তুলে আস্তে হাঁটল]

গৌতম। নন্দিতা দেবী, নন্দিতা—এই আমি প্রথম আপনাকে ছুঁলাম। এত ভাল লাগছে আপনাকে। আমি আপনাকে কেবল নন্দিতা বলব। আপনার দৃষ্টির মতো হাল্কা লাগবে নাম—নন্দিতা, নন্দিতা—কেবল নন্দিতা। তুমি কথা বলো। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব আমি। পৃথিবীর যে যা খুশি বলুক, আমি মানব না, শুনব না। নন্দিতা, তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এইখানে বোস। (বসল নন্দিতা, ওর মুখের দিকে গৌতম মগ্ন চোখে তাকাল) কি আশ্চর্য! আমি আর 'আপনি' করে বলছি না। যেমন করে একটা ফুলের পাপড়ি অনায়াসে খুলে যায়, একটুও পরিশ্রম হয় না, তেমনি নিঃশব্দে, আনন্দে, হঠাৎ

আমি তোমাকে তুমি বলছি। নন্দিতা, নন্দিতা তুমি শুনতে পাও। (নন্দিতার মুখটা মধুর দেখাল। অনেকটা স্পষ্ট তাকাল) নন্দিতা, এক্ষুনি সেই বাক্সটা নিয়ে সোমেন্দু বাবু আসবেন, শাবলের শব্দ আর শুনতে পাচ্ছি না। কথা বলো. আমাকে চিনতে পারছ? আমার নাম কি বল? বল?

নন্দিতা। (ম্লান, অস্পষ্ট গলায়) গৌ-ত-ম ব্যা-না-র্জি! গৌতম ব্যানার্জি!

গৌতম। আবার বল, স্পষ্ট করে বল?

নন্দিতা। গৌতম ব্যানার্জি; গৌতম—পারছি না, গৌতম, গৌতম —গৌতম—

(মাথাটা টেবিলে নুইয়ে 'গৌতম' শব্দটা বার বার উচ্চারণ করল। যেন নামটা ওর সারা মনে মাখছে কষ্টে, সুখে, গোপনতায়।]

গৌতম। আমার নাম তোমার মুখে কি সুন্দর। আমি জানতাম না, জানতাম না!

[মাটি মাখা কারুকার্য করা একটা ছোট বাক্স হাতে দরজার কাছে গম্ভীর মুখে এসে সোমেন্দু দাঁড়ায়।]

গৌতম। (প্রবল চীৎকার করে) নন্দিতা, দ্যাখো, দ্যাখো—ঐ সেই বাক্সটা, সেই বাক্সটা।

[দৌড়ে এসে দুহাতের মধ্যে নিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। নন্দিতা ওর দিকে ম্লান তাকিয়ে। খুব আস্তে এগিয়ে এল গৌতম।]

গৌতম। কি ভীষণ হাল্কা বাক্সটা। যদি কিছু না থাকে! খুলতে আমার ভয় করছে নন্দিতা, ভীষণ ভয় করছে।

সোমেন্দু। চাবিটা আপনার কাছে। খুলুন।

গৌতম। খুলব?

সোমেন্দু। খুলতে তো হবেই, আমারও তো একটা পাওনা রয়েছে।

[খুলল গৌতম। ডালাটা তুলে বিস্ফারিত তাকাল। মুখে একটা নিদারুণ বিস্ময় আর যন্ত্রণার ক্লান্তি ফুটে উঠল।]

গৌতম। একি ! এ আমি কি দেখছি ! মণিমুক্তোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই বাক্সে—কেবল আমার হাতের এই চাবিটার মতো আরেকটা চাবি—কেবল আর একটা চাবি। হা ঈশ্বর, আবার সেই চাবি !

সোমেন্দু। ওটাকে দু-ভাগ করা যায় না। আমি চলি। এ খেলায় আমার কি লাভ হল জানি না। যেটুকু এল পুরো আপনাদের থাক। নমস্কার, চলি। এরকমই হবে আমি ভেবেছিলাম। [সোমেন্দু চলে গেল]

গৌতম। নন্দিতা, আমার কি ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। কি ভীষণ ক্লান্তি ! নন্দিতা, এই চাবিটা দিয়ে আমি কি আবার কোন মণিমুক্তোর বাক্স খুঁজে যাব ? তুমি আমার দিকে তাকাও, আমি কি আবার খুঁজে যাব ? সমস্ত ঘরটার মতো, দেয়ালের মতো, হৃদয়টা কুপিয়ে কুপিয়ে আমি কি আবার খুঁজে যাব। (নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে) তোমার মুখ কি সুন্দর উদ্ভাসিত লাগছে, তোমার মুখে আমি কি দেখছি ? তোমার দৃষ্টিতে আমি কি দেখছি ? নন্দিতা, মনে হচ্ছে তোমার বুকের মধ্যে সেই কাজ করা মণিমুক্তোর বাক্সটা, আমি ওটাকে খুঁজে পাইনি এতকাল··· নন্দিতা তোমার মধ্যে এত মুক্তো, এত হীরে···সব ঐ বাক্সটায় সাজিয়ে রেখেছ। আমি এই হীরের আলোতে মুখ ডুবিয়ে রাখব ; তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি কর—সমুদ্রে ছুঁড়ে দাও, আকাশে ছুঁড়ে দাও, পাতালে ছুঁড়ে দাও যা খুশি কর। কিন্তু নন্দিতা (ভাঙাচোরা আর্তনাদের গলায়) নন্দিতা, তোমার বুকের ভিতরের ঐ বাক্সটা খুললে যদি আবার সেই চাবি,···কেবল একটা চাবি !

[বিষণ্ণ মাথাটা ঝুলে পড়ল গৌতমের। নন্দিতা বিমর্ষ তাকিয়ে থাকল]

—ঃ পর্দা ঃ—

১৯৭৩

ফিনিক্স

চরিত্র ঃ লরেন্স, ফ্রিডা, বার্থা।

স্থান ঃ ভেনিস   সময় ঃ বিকালের শেষ

[লরেন্স একটি 'সানপর্চে' বসে আছে। দক্ষিণ দেয়ালের জানালা সূর্যের মুখোমুখি, আর খোলা দরজাটা সমুদ্রের দিকে। বাতাস বইছে, সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। লরেন্স এদিকে তাকিয়ে। তাঁর পিছনে, বাঁ দিকের দেয়ালে লাল, রুপোলি আর সোনা রঙে বোনা একটা বড় ব্যানারে লরেন্সের প্রিয় সিম্বল ফিনিক্সের ডিজাইন, আগুনের শিখায় ফিনিক্স জ্বলছে।

লরেন্স বসে আছে—স্থির, নীরব। দাড়ি লালচে, অবিচল মুখটা যেন পোড়া মাটির মধ্যে তীব্র লালের সামান্য ছোঁয়া লাগিয়ে বানানো। একটা চেকার্ড ব্ল্যাঙ্কেট আর লাভেন্ডার উলের শাল জড়ানো। লরেন্সের যে হাত জীবনটাকে তীব্র মুঠোয় চেপে ধরে যেমন খুশি গড়ন দিয়েছে তা কেমন অবশ ভঙ্গীতে কম্বলের উপর। স্ফুরিত নাক অতি সযত্নে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন আকস্মিক তীব্র টান লাগলে সিল্কের পলকা সুতোর মতো নিঃশ্বাসের সূক্ষ্ম বাতাস হঠাৎ ছিঁড়ে যাবে। ভিতরের কোনো জ্বালা লরেন্স চেপে রাখছে বোঝা যায়। তাঁর ভিতরের বাঘটা খাঁচায় আটকে আছে, কিন্তু এখনো মরেনি।

ফ্রিডা ভিতরে আসে—সবল, ছড়ানো চেহারা, সুন্দর, বয়স পঞ্চাশ। তাঁকে দেখে অনেকটা 'ভলকিরি'র মতো মনে হয়—জার্মান পুরাণের প্রধান দেবতা ওডিনের অনুচরীদের মধ্যে একজন সেই 'ভলকিরি' যে সেই বীরদের বেছে নেয়, যারা যুদ্ধে নিহত হবে, এবং তাদের আত্মা বহন করে নিয়ে যায় আত্মার কোষাগার ভলহল্লা কক্ষে। ফ্রিডার হাতে একটি ছোট প্যাকেট, বেশ সৌখিন।]

লরেন্স। (ঘাড় না ঘুরিয়ে) ওটা কি নিয়ে এলে ?

ফ্রিডা। দরজার সিঁড়িতে এক্ষুনি কে রেখে গেল।

লরেন্স। আমার কাছে নিয়ে এস।

ফ্রিডা। জানালা দিয়ে দেখলুম, প্যাকেটটা রেখেই কে যেন দ্রুত চলে গেল—চেনাশোনা কেউ নয় বলেই মনে হোল।

লরেন্স। কোন মহিলা ?

ফ্রিডা। হ্যাঁ…

লরেন্স। হ্যাঁ ?

ফ্রিডা। তাই মনে হল। মটর-শুটি রঙের একটা জ্যাকেট ছিল গায়ে। আমি দরজাটা খুলতে যাব, তার আগেই সিঁড়ির কাছে টুপ করে রেখেই ছুট।

লরেন্স। (গলায় ঝাঁজ বাড়ে, কিছুটা তীক্ষ্ণ) নিশ্চয়ই আমার জন্য রেখে গেছে, তাই না ?

ফ্রিডা। (প্যাকেট লক্ষ্য করে) তাইতো মনে হচ্ছে।

লরেন্স। মনে হচ্ছে নয়—ঠিক তাই। কিন্তু জিনিসটা সেই থেকে আমার চোখের আড়ালেই বা রাখছ কেন, ফ্রিডা ? যা তোমার নয়—সেটা এতক্ষণে আমাকে দেয়াটাই তোমার উচিত ছিল। (ক্রুদ্ধ) ফ্রিডা, তুমি কি আমাকে রাগিয়ে মজা পেতে চাও ? ফ্রিডা !

ফ্রিডা। (প্যাকেটটা লরেন্সের হাতে দেয়) ডাক্তারের কথা তুমি শুনবেনা বলে প্রতিজ্ঞা করেছ বুঝি ? সেই তুমি উত্তেজিত হবে, চিৎকার করবে—তুমি কি কারুর কথা শুনবে না ? আজ বিকেলটায় মনে হচ্ছিল রোদ্দুরের আঁচে তোমার মনটা ঝকঝকে হয়ে উঠেছে…

লরেন্স। রোদ্দুর ! ঐ বেল্লিক বুড়ো সূর্যটার থলে ঝাড়া রোদ্দুরের কথা বলছো তো ? গোটা বিকেলটায় আমরা দুজন দুজনকে কেবল মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কেটেছি। তাছাড়া কিইবা করার ছিল ! কতবার মনে মনে আকাশের উষ্ণ আলোর দিকে তাকিয়ে বলেছি, তুমি কি আমাকে ভাল করে দিতে পার না, শরীরে কি আর একটু জোর পাব না। আমার দু হাত ধরে জোরে টান মেরে এই চেয়ারটা থেকে তুলে নাও। কিন্তু কে কার কথা শোনে ! আমার ভিতরটা একবিন্দু তাপ, একফোঁটা আলোর জন্য খা খা

করছে—আর বুড়ো বদমাশ ঐ সূর্যটা যেন কানেই শোনেনা অথচ চাকরের মত ওর বাড়িতে আলো ছড়াচ্ছে, তার উঠোনে তাপ বিলোচ্ছে! অথচ জানো ফ্রিডা আমি ভিক্ষে চেয়েও পাইনা!

ফ্রিডা। (সস্নেহ, বিষণ্ণ) লরেঞ্জো, তুমি ভিক্ষা চেয়েছ? ভিক্ষে নিতে হলে দুখানা হাত কেমন করে বাড়িয়ে দিতে হয় তুমি তো জানতে না!

লরেন্স। (ফ্রিডার দিকে তাকায়। দুহাতে নিজের মুখটায় যেন কি মোছে। খুব আস্তে বলে) ফ্রিডা, এই চেয়ারটায় বসলে আমার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে কাশিতে কাঁপতে কাঁপতে, দাঁতে, জিভে রক্ত জড়িয়ে কার একটা অবশ গলা বেরিয়ে আসে। সত্যি ফ্রিডা, ভিক্ষে আমি ভালবাসিনা। তুমি তো জানো আমি কেড়ে নিতে চাই। শক্ত মুঠো আছাড় দিয়ে ভেঙে ভেতর থেকে লুকোনো হীরেটা টান মেরে নিতে চাইতাম। (ফ্রিডা প্যাকেটটা খুলেছে। ওদিকে তাকিয়ে) আরে, কি আশ্চর্য, কি মজার খাবার পাঠিয়েছে দ্যাখো—অরেঞ্জ মারমালেড্। ফ্রিডা, আমি ঠিক যা সবচেয়ে ভালোবাসি! (ছোট্ট শিশুর মতো) খাবো? না বাবা রয়ে সয়ে খাবো, ফুরিয়ে গেলেই সেরেছে। একটা বয়ামে রেখে দাও। মারমালেড্, তার মানে এটা আগস্ট মাস, বুঝতে পারলে? একটুও ভাগ বসাতে পারবে না। যাকগে, অল্প একটু খেও।

ফ্রিডা। আমার চাইনা, ব্রেকফাস্টের সময় কাল খেও। এখন একটুও নয়—এক্ষুনি ওষুধ খেয়েছ।

লরেন্স। আঃ হাঃ, যতদিন বাঁচব রোজ ব্রেকফাস্টের সময় খাবো। ছাখো যেন মেপেজুপেই দিয়েছে—আমিও ফুরোব, মারমালেডও শেষ!

ফ্রিডা। চুপ করোতো !

[ফ্রিডা লরেন্সের হাত থেকে প্যাকেটটা নিতে চায়। দ্রুত বেড়ালের মত যেন থাবা মেরে ফ্রিডার হাতটা ধরে ফেলে লরেন্স]

লরেন্স। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

ফ্রিডা। (হেসে) ব্বাঃ, এখনো বেশ জোর রয়েছে তো তোমার গায়ে। রোদে, ওষুধে ফল ধরেছে দেখছি।

লরেন্স। শিরায়, কব্জিতে, রক্তে, বুকে এখনো দাপট আছে, ব্যাপারটা তো ইদানিং তুমি ভাবতে চাইতে না।

ফ্রিডা। আসলে আজকাল তুমি এত শান্ত, আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কোন কালে তুমি অন্য রকম ছিলে।

লরেন্স। (ভিতরে অসহিষ্ণু হতে থাকে) তোমার ধারণা, সেদিনের বুনো লরেন্সকে তুমি একটু একটু করে বশ করেছ, একটা পোষা, নিরীহ, গৃহপালিত কিছু একটা বানিয়ে তুলেছ ?

ফ্রিডা। আমার উপর রেগে গিয়ে নিজেকে নিয়ে অতটা রুক্ষ ঠাট্টা নাই বা করলে। তবে আমার একটা সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। এখানকার লাল সূর্যটা লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি চুমুক দিচ্ছ আর ভিতরটায় যেই টাটকা তেজ আসছে তার সবটুকু জড়ো ক'রে কেবল আমাকে বিদ্রূপ করে যাচ্ছ তাইনা ?

লরেন্স। (মনের রাগ দু হাতে জমিয়ে ফ্রিডার হাত আরো শক্ত করে ধরে) বিদ্রূপ ? তুমি কতটুকু বোঝ ? রক্তের ভিতরের অভিসন্ধি কতটুকু টের পাও ? আসলে আমি ধীরে ধীরে একটা ইস্পাতের ঝকঝকে খাঁচা বানাচ্ছি যাতে তোমার ঐ বদরাগী দেমাকে বিগড়ে যাওয়া শরীরটা আবার বন্দী করতে পারি। (হাতে চাপ দিয়ে দেখি, কেমন ছাড়িয়ে যেতে পারো।

ফ্রিডা। (কাতরোক্তি করে, ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে) উঃ, কি করছ, লাগছে—হাতটা ভেঙে যাবে যে !

লরেন্স। (আস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে। অবশ গলায়) ফ্রিডা, দোহাই তোমার মিথ্যেকথা বোলো না। তোমার একটুও লাগছে না। ওরকম ভান করে বোঝাতে চেওনা আমি আবার বাঁচব। (তীব্র গলায়) ফ্রিডা, মরে যাবার আগে অনুকম্পা চাই না। (ফ্রিডার দিকে তাকিয়ে) আঃ ফ্রিডা—তোমার শরীর কি সুন্দর! উজ্জ্বল। এত স্বাস্থ্য! তুমি আরো কতদিন বাঁচবে! ঈশ্বর তোমাকে কেন এত দিলেন—আর আমাকে? এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছি! তুমি এখন আমার হাতটা ধরে একটা শুকনো কাঠির মতো ভেঙে দিতে পারো!

ফ্রিডা। লরেঞ্জো! (লরেন্স ফিনিক্সের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে)

ফ্রিডা। লরেঞ্জো! আগে কোনদিন তোমার সঙ্গে আমি জিততে পারতুম না। সেসব কথা আমি মনে মনে ভাবি। সে মানুষটা হারিয়ে যায় নি—সে ফিরে আসবে। ফিনিক্স আবার ফিরে আসে।

লরেন্স। (ছবিটার দিকে তাকিয়ে) আবার ফিরে আসে। ঠিক আছে, ফ্রিডা, তুমি মারমালেডের জারটা শেল্‌ফে রেখে দাও। আমার চোখের সামনে রেখো।

[প্যাকেটটা ফ্রিডার হাতে দেয়। ওর গায়ে একটা কার্ড আবিষ্কার করে ফ্রিডা।]

ফ্রিডা। দেখেছ, এর গায়ে একখানা কার্ডে মেয়েটা কি সব লিখে রেখেছে। (পড়ে) 'আপনার অনুরক্ত পাঠকদের একজন।' অন্য পিঠে লিখেছে, "মিঃ লরেন্স, আপনি পূজনীয় কারণ একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া জীবনটাকে এতখানি কেউ ধরতে পারেনি। আপনিও ঈশ্বর মিঃ লরেন্স।"

লরেন্স। (শুকনো গলায়) এরা বড় সহজে ঈশ্বরকে খুঁজে পায় ফ্রিডা! বৃষ্টি নামলে একটা গাড়ি বারান্দা পেয়ে গেলে

সেই আশ্রয়টুকুও এদের ঈশ্বর। কি স্মরণীয় অবিশ্বাস! নীলচে জ্যাকেট গায়ে বিকেলের রোদে তুলতে তুলতে একটা মারমালেডের জার ঈশ্বরের বেদীর উপর রেখে লুকোচুরি, এইতো পূজো! ঈশ্বরকে কত সহজে নৈবেদ্য শেষ হোল। অথচ আমি যদি আমার ঈশ্বরকে পেতাম…কখনো পেতাম, আমি সেই প্রখর ঈশ্বরের সামনে হৃদয়টা ছিঁড়ে এনে তাঁর সামনে দাহ করতাম! কিন্তু কোথায় সেই ঈশ্বর? হয় আমাকে সে ভয় পায় কিংবা আমি তাকে চাইনি। এ-এক যন্ত্রণা! অসহ্য।

ফ্রিডা। অথচ ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মতো তুমি যন্ত্রণা ভালবাসতে। যীশুর সঙ্গে তোমার বিরোধ কোথায়? তুমি তো অন্য এক খ্রীষ্ট।

লরেন্স। (এবার শান্ত গলায়) ফ্রিডা, আবার সেই অনুকম্পা! আমার এই দশটা আঙুলের মধ্যে তোমার গলাটা যদি আমি চেপে ধরতে পারতাম তুমি দেখতে একটা জীবনকে ভীষণ পিষ্ট করে আমি কি দারুণ এক খ্রীষ্টের মূর্তির মতো জেগে উঠতে পারি।

ফ্রিডা। (কাছে হাঁটু মুড়ে বসে, গলা বাড়িয়ে দেয়) এই নাও ধরো, আমার শ্বাসরোধ করে চেপে ধর।

লরেন্স। (আলগোছে আঙুলগুলো গলায় মাথায় বুলিয়ে) ফ্রিডা, আমি কি আবার নিউ মেক্সিকো ফিরে যেতে পারবো?

ফ্রিডা। তুমি যা চাইতে, কোন বাধা তা আটকাতে পারেনি। লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে, নাহলে হামাগুড়ি দিয়ে, নয় দু'হাতে মুচড়ে তুমি জিতে নিতে। তুমি সব পারো লরেঞ্জো।

লরেন্স। রূপোলি বালি ছড়ানো একটা মরুভূমির উপর দিয়ে একটা তেজী সাদা ঘোড়ায় চেপে বসে দামাল বাতাসের মত আমি কি ছুটে যেতে পারবো? আমি কি কেবল লিখব?

বইয়ের শুকনো দেয়ালে পদাঘাত করব ? কেউ জানেনা, কেবল বই লেখার মধ্যে আমার ফুরিয়ে যাওয়া কি ভীষণ একটা বাজে রসিকতা।

ফ্রিডা। তোমার লেখাটা কি জীবন নয় ?

লরেন্স। একটা ছোট জগৎ—মাপা, সাজানো, নির্বাচিত। আসলে জীবনটা একটা বিস্ফোরণ, একটা অতিকায় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল ঘটনা, কিংবা দামাল একটা গতি কিন্তু আমি কি করেছি ? কিছু পাণ্ডুলিপি, বিছানায় গলা জড়ানো অসংখ্য মেয়েলি ফাঁস আর ভাঙা স্বাস্থ্যের চাপা গোঙানি! পুরনো কথা, পচা নীতি, গলে পড়া ধারণা—আমি এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, তাই না ? কিন্তু ফ্রিডা, যুদ্ধে জিতে যাওয়ার থেকেও রণক্ষেত্রে যাবার অধিকার হারানো আরো বৃহৎ ক্ষতি। যদি এখন আমি একটা আদিম বুনো মানুষের মতো মরুভূমির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, যদি দশ মাইল দূর থেকে মাথায় মুকুট পরা দানবদের মতো যে ঝড়টা ছুটে আসতো আমি তাকে বুক পেতে রুখে দাঁড়াতাম। আমি এখনো তা পারি, তোমাদের অবিশ্বাস চুরমার করে তা স্পষ্ট পারি।

ফ্রিডা। কে বলছে, তুমি পারো না!

লরেন্স। (ক্ষিপ্ত) তুমি। আবার কে ? তুমি। তুমি জানো আমার ভিতরে বন্য পুরুষটা ধুঁকছে কিংবা গলা দিয়ে খানিকটা শেষ রক্ত উগড়ে সে মরে যাবে। মেয়েরা মৃত্যুকে আগে থেকে টের পায়। মৃত্যু পা ফেলে একবার আগেই মেয়েরা তার অভিসন্ধি টের পায়। আমি বুঝি ঐ মেয়েরাই মৃত্যুকে দরজা খুলে দেয়। তারা ফিসফিস করে ডাকে, হাতছানি দেয়, অ্যাপ্রণের তলার খিড়কি দিয়ে মৃত্যু মন্থর চলে আসে। তাই না ?

ফ্রিডা। না, মেয়েরা জীবনটাকে ডাকে. নিজে দাম চুকিয়ে তাকে

নিয়ে আসে। তাদের দু'খানা হাত দুটো দুয়ারের মতো খুলে জীবনটাকে ডাকে। পুরুষ মৃত্যু ভালোবাসে···মেয়েরা নয়। পুরুষ ক্ষত বানায় মেয়েরা রক্তপাত মুছে দেয়।

লরেন্স। রক্তপাত মুছে দেয়? কিন্তু কি ভাবে? ঠোঁটে রক্তটা শুষে নিয়ে? রক্ত মুছে দিতে নয়, রক্ত ওদের জিভে বড় মধুর! (ফ্রিডা ওর গায়ে হাত রাখে) আমাকে ছোঁবে না। তোমার আঙ্গুলগুলো জিভের মতো রক্ত খুঁজছে, আমি বুঝি না, না? আমাকে ছোঁবে না।

ফ্রিডা। এ তুমি কি বলছ, লরেঞ্জো!

লরেন্স। প্রচণ্ড সত্য কিছু বলছি।

ফ্রিডা। তুমি একটু শান্ত হও।

লরেন্স। কেন? ভিতরটা ছটফট করে নড়লে রক্ত টেনে তুলতে তোমার অস্থবিধে তাই তো? ফ্রিডা, আজ তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ফ্রিডা। কিসের প্রতিজ্ঞা?

লরেন্স। যা কোনক্রমে তুমি ভাঙতে পারো না, সেই প্রতিজ্ঞা।

ফ্রিডা। বল।

লরেন্স। (কাশে) ফ্রিডা···আমি যদি মরে যাই!···

ফ্রিডা। লরেঞ্জো!

লরেন্স। যে মুহূর্তে আমি মরব, আমি সম্পূর্ণ একা থাকব। আমাকে ছোঁবে না, আমার শরীর তোমার আঙ্গুল ছোঁবে না! আর কোন মেয়েকে আমাকে স্পর্শ করতে দেবে না, এই প্রতিজ্ঞা। (ফ্রিডা ওর মুখের দিকে তাকায়) আমি মাঝে মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি, ফ্রিডা—আমি যেন মারা যাচ্ছি, আর চারিদিকে অসংখ্য নারী। আমি তাদের ঠেলে সরিয়ে দিতে পারব না জেনেই যেন তারা দরজা, জানালা ভাসিয়ে আমার চারপাশে ঝাঁপিয়ে আসছে। পুড়ে যাওয়া ফিনিক্সের চতুর্দিকে তারা কাঁদবে আর পাখির

ডানা ঝাঁপটিয়ে ভস্ম ওড়াবে। সিনেমার কায়দায় চুমুর উপর চুমু, নানারঙের চোখের জল, কুমারী আর মহিলাদের যৌন ভক্তির উদারা-মুদারা-তারায় আক্ষেপ! তাছাড়া তাদের কান্না—কারণ আমি নাকি যৌনতা সম্পর্কে দৈববাণী করতাম! আমি···আমি এসব চাই না! আমি একা, একটা জন্তুর মত মরতে চাই। পাশে কেউ নেই। কেবল আমার ক্রোধ, ভয় আর ভালোবাসা—এই তিনজন একটা পরিচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ মৃত্যুর সাক্ষী হবে। এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে রাখতে হবে।

ফ্রিডা। এ আমি ভাবিনি লরেঞ্জো!

লরেন্স। তার মানে তুমি অবাধ্য হচ্ছ।

ফ্রিডা। আমি তা বলিনি।

লরেন্স। ফ্রিডা, আমি জানি—একটু বাদেই শেষবারের মতো গলা দিয়ে রক্ত বেরুবে শেষবারের মতো; আমাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যাবে না। না, কোন মেয়েদের সেবাও নয়। এই ঘরে আমি থাকব না। এই দরজাটা খুলে আমি বেরিয়ে যাব। আমি চাই না কেউ আমার পিছে পিছে আসে। এটাই সব থেকে দরকারী কথা। ফ্রিডা, আমি একা। একাই আমার শেষ কাজটা করতে চাই। কোন হাত নয়, কোন দৃষ্টি নয়, নারী, ওষ্ঠ, হৃদয়—কিছুনা! রুক্ষ পাহাড়, চন্দ্রালোক আর গম্ভীর জলস্রোতের নির্দয়তা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তুমি প্রতিজ্ঞা করলে!

ফ্রিডা। করলাম।

লরেন্স। আমি জানি, তুমি কথা রাখতে জানো।

ফ্রিডা। হয়তো তুমি ঠিকই জানো লরেঞ্জো।

লরেন্স। হয়তো শব্দটি বর্জন করো।

ফ্রিডা। প্রতিজ্ঞা করছি।

লরেন্স। ফ্রিডা···আমি বিশ্বাস করলাম।

ফ্রিডা। আছে, এখন অন্য কিছু বলো। একটু চা করছি।

লরেন্স। (হঠাৎ অ্যাকুইরিয়ামটা দেখে) এ কি ?

ফ্রিডা। কি হোল ?

লরেন্স। অ্যাকুইরিয়ামের গোল্ড ফিসটা দেখছি না! সেই বেড়ালটা নিশ্চয়ই চিবিয়ে খেয়েছে ?

ফ্রিডা। বেড়ালটা খেয়েছে তুমি কি করে বুঝলে ?

লরেন্স। বুঝলাম কি করে, চারটে মাছ ছিল, এখন তিনটে আছে দেখছ না ?

ফ্রিডা। তাতে কি বোঝাল—বেড়ালটা খেয়েছে ?

লরেন্স। নির্বোধের মত তর্ক কোরোনা ফ্রিডা। তুমি জানোনা! তুমি ডালাটা খুলে রাখোনি ?

ফ্রিডা। না।

লরেন্স। আমাকে বিরক্ত কোরোনা। তুমি ঐ বেড়ালটাকে ভালবাস না ?

ফ্রিডা। বেড়ালটা সারাদিন ঘরেই ছিল না।

লরেন্স। ও, ফ্রিডা···তুমি এতদূর নেমেছ। তুমি আমাকে মিথ্যে বলে একটা বেড়ালের পক্ষ নিতেও রাজি—তাইনা ? কেন ? কেন, অবশ্য তা আমি জানি। তুমি উচ্ছন্নে গেছ ফ্রিডা !

ফ্রিডা। এরপর থেকে ওটা তোমার চোখের সামনে রেখে দেব।

লরেন্স গোল্ড ফিসটা কোথায় গেল ?

ফ্রিডা। অকারণ উত্তেজিত হোয়না।

লরেন্স আমি জানতে চাই। কিংবা জানি।

ফ্রিডা। (বিরক্ত) কি জানো ?

লরেন্স তুমি বেড়ালকে ঐ গোল্ড ফিসটা খেতে দিয়েছ ? তোমার মত মেয়ের পক্ষেই এটা সম্ভব।

ফ্রিডা। তোমার মাথার ঠিক নেই।

লরেন্স কারণ ভীষণ সত্য কথা বলছি। তুমি আর বেড়ালটা দুজনেই লোভী, স্বাস্থ্য ভালোবাসো, আরো বাঁচতে চাও।

তাই দুজনের মধ্যে গোপন সন্ধি হয়ে আছে। এখনো ক্ষিধে তীব্র। ঐ বেড়ালটার ক্ষিধেটা তুমি বোঝ···তাই ওকে জ্যান্ত মাছটা তুলে খেতে দাও। আমার ক্ষিধে ফুরিয়ে যাচ্ছে, আমি তাই বাতিল। তোমাদের থেকে দলচ্যুত, তাই না ?

ফ্রিডা। একটা তুচ্ছ মাছ নিয়ে তুমি এত কথা কোন কালে বলতে না।

লরেন্স। ব্যাপারটা তুচ্ছ মাছ নিয়ে—কিন্তু ষড়যন্ত্রটা পৃথিবী জুড়ে।

ফ্রিডা। ও, লরেন্স !

[চোখ ঢাকে]

লরেন্স। বোধহয় কাঁদছ, কিংবা কাঁদবার চেষ্টা করছ। থামো। কান্না আমি দেখতে পারিনা। আমার শরীর খারাপ লাগে।

ফ্রিডা। (চোখ তুলে) লরেন্স, আমার বিশ্বাস, আসলে তুমি আমাকে ঘৃণা কর।

[খানিক চুপচাপ। তারপর কেমন সঙ্কোচ নিয়ে ফ্রিডার হাতটা ছোঁয়]

লরেন্স। আমাকে বিশ্বাস কোরোনা······ফ্রিডা, চায়ের মধ্যে একটু রাম মিশিয়ে দিও। মনে হচ্ছে, যেন একটু ভাল লাগছে।

ফ্রিডা। (কপালে হাত রেখে) একটু বিছানায় গিয়ে শোবে ?

লরেন্স। বিছানায় শুলে মনে হয় ফ্রিডা, আমি চাদরের সঙ্গে এঁটে যাব—আর খুলতে পারব না। কি দেখলে, জ্বর হয়েছে ?

[ফ্রিডা ভালবেসে ওর দুচোখে হাত বোলায়। চোখ বুজে লরেন্স ছড়া কাটে]

লয়েন্স। "Ladybug, Ladybug, fly away home ; thine house is on fire, the children will burn !"
মা যখন কোন ভাল মানুষ দেখতেন এটা গাইতেন। আজকাল সব মানুষ এত জটিল, তোমার মত এত সরল নয়।

ফ্রিডা। (উঠে ফিনিক্সের ছবিটার কাছে গিয়ে) আগুনের মধ্যে এই রাগী অথচ সাহসী পাখিটা আসলে একটা ছোট্ট ভাবপ্রবণ শিশু, তাইনা লরেন্স?

[লরেন্স বাইরে তাকিয়ে]

লরেন্স। তিন কাপ চা।

ফ্রিডা। কেউ আসছেন?

লরেন্স। বার্থা! আমার ছবির এক্সিবিসনের খবর নিয়ে লণ্ডন থেকে ফিরছে।

[লরেন্স চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে কষ্ট করে এগোয়]

ফ্রিডা। কোথায় যাচ্ছ?

লরেন্স। এক্সিবিসনের প্রথম খবরটা আনছে, নিশ্চয়ই দৌড়ে গিয়ে ওকে টেনে আনা উচিত।

ফ্রিডা। বোসো। আমি যাচ্ছি। আর শোন, এ বাড়িতে ওকে থাকতে বলবে না, তা হলে কিন্তু আমি থাকব না।

লরেন্স। (মুখে ক্লাক্ ক্লাক্ শব্দ করে) ভাবছ মোরগটার পাশে আরো মুরগী এনে জড়ো করব?

[ফ্রিডা চলে যায়। লরেন্স চেয়ার ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করে। কম্বলটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর জোর করে দু পায়ের উপর দাঁড়ায়। প্রায় টলতে টলতে, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে কিচেনের দিকে চলে যায়। কাশতে থাকে। পর্দার আড়ালে কাশিটা অবসন্নভাবে থামে। ফ্রিডা বার্থাকে নিয়ে ঢোকে। বার্থা বালকের মতো তাড়াতাড়ি কথা বলে, চাউনিও শিশুর মতো।]

ফ্রিডা। একি, ও কোথায় গেল?

বার্থা। চেয়ার ছেড়ে ওঠা তো ওর ঠিক নয়।

ফ্রিডা। আর একবার রক্ত উঠলে আর ওকে বাঁচানো যাবে না। একটু পরিশ্রমেই ও শেষ হয়ে যেতে পারে। দেখেছ কাণ্ড। এক মিনিট বাইরে গেলুম, অমনি……লরেঞ্জো! লরেঞ্জো।

লরেন্স। (বাইরে থেকে) মুরগীগুলো বড্ড ডাকছে ! চা নিয়ে আসছি।

বার্থা। তুমি যাও। সত্যি সত্যি ও নিজে চা করছে নাকি ? তুমি যাও।

ফ্রিডা। এখন গেলে নতুন রকম একটা অনর্থ বাধাবে। কোন লাভ নেই গিয়ে।

বার্থা। ও কি মরবে নাকি ? এই শরীরে—

ফ্রিডা। ও মরবে না। ওর লাঙ্‌সটা নেই, অথচ নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হার্টটা জুড়িয়ে গেছে তবু দপ্‌ দপ্‌ করছে। এ একটা অদ্ভুত যুদ্ধ বার্থা। আর এই যুদ্ধটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। এক এক সময় মনে হয় সব শেষ হয়ে গেলেই ভাল।

বার্থা। ফ্রিডা !

ফ্রিডা। ওর শরীরটা দেখলে আমার মনে হয় কাগজে তৈরী, একপাশে আগুন লেগে গোটাটা দাউ দাউ করে ধরে যাচ্ছে। মরে যাবার অনেক আগে থেকেই যদি মানুষের বাঁচার ইচ্ছেটা মরে যেত। তাহলে শান্তভাবে রক্ত মাংসের শরীরটা মোমের মত গলে যেতে পারতো। আগুনের সঙ্গে কাগজের এই মর্মান্তিক যুদ্ধ, ভাগ্যিস তোমাকে দেখতে হচ্ছে না বার্থা। আর এই যুদ্ধের ফলাফলটা আগে থেকেই জানা।

বার্থা। লরেন্স মরতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না।

ফ্রিডা। শরীর ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ওর শরীর শেষ হয়ে আসছে।

বার্থা। ফিনিক্স মরে না। ওর দেহটা সব কথা নয়। পুড়ে গেলেও থাকে।

ফ্রিডা। ফিনিক্স্‌ উপকথা। লরেন্স মানুষ, রক্ত মাংসের নিয়মের মানুষ।

বার্থা। লরেন্স মানুষের থেকে অনেক বেশী।

ফ্রিডা। শরীর ব্যাপারটা তুমি জানো না। যে যত বড়ই হোক তার একটা অসহায় শরীর থাকে।

বার্থা। লরেন্স ঈশ্বর।

ফ্রিডা। আমি তার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি বলেই জানি, লরেন্স ঈশ্বর নয়।

বার্থা। আদিম ইচ্ছার বাইরেও অনেক কিছু থাকে।

ফ্রিডা। আদিম জ্ঞানই আগে আসে।

বার্থা। আমি তোমার কথা মানি না।

ফ্রিডা। কিন্তু লরেন্স মানে। লরেন্স জানে। শরীর বাদ দিয়ে মেয়েদের লরেন্স বুঝতে পারে না। নারীর আত্মা শরীর ছাড়া বাঁচে না।

বার্থা। ফ্রিডা, তুমি লরেন্সকে শরীর দিয়ে যদি একটু কম বাঁধতে।

ফ্রিডা। তোমার থাবাটা লরেন্সের উপর রাখলে তুমি কি করতে?

বার্থা। আমার হাতকে অন্তত থাবা বলতাম না।

ফ্রিডা। লরেন্সের শরীর থেকে অশরীরি লরেন্সকে তুলে নিতে একটা থাবা তো চাই। তারপর সেই নিরাকার লরেন্সকে কোথায় রাখতে? বাতাসে? ক্যাণ্ডেলের শিখাটা তুলে নিয়ে একদিন তুমি লরেন্সকে উপহার দেবার চেষ্টা কোরো। যাকগে, আমরা দেখা হলেই তর্ক করি। আজ থাক।

বার্থা। ফ্রিডা!

ফ্রিডা। তুমি লরেন্সকে বোঝনি, বার্থা। লরেন্সকে নিয়ে আমাদের ভাগ ভাগ করে নেয়া--কি দরকার। ও গোটা লরেন্স থাক। ও যা তাই থাক।

বার্থা। লরেন্সকে ভাগ করা যায় না, আমি তা জানি।

ফ্রিডা। চুপ, আসছে।

বার্থা। (পর্দাটার দিকে একটু এগিয়ে) লরেঞ্জো!

লরেন্স। (পর্দার আড়ালে) Pussy cat, Pussy cat, where have you been?

বার্থা। (মজা করে) I have been to London to look at the Queen.

লরেন্স। (একটু এগিয়ে আড়ালে।) Pussy cat, Pussy cat. What did you there?

বার্থা। I chased a little mouse under a chair.

[হাসতে হাসতে লরেন্স ঢোকে। তিনকাপ চা ট্রেতে। বার্থা আর ফ্রিডা সভয়ে তাকায়]

বার্থা। লরেঞ্জো, তোমাকে দেখলে মনে হচ্ছে, তোমার একটুও অসুখ নেই। মুখটা রক্তে লাল।

লরেন্স। জ্বরের লাল, গলার কাছে যে রক্ত তার ছায়ায় লাল। আমি পুড়ে যাচ্ছি বার্থা, কিন্তু পুড়ে পুড়ে ফুরোচ্ছি না। (হাসে) ডাক্তাররা অবাক—হতাশও বলতে পারো। ফ্রিডাকে ত্যাখো, বিধবা হবো হবো করেও হতে পাচ্ছে না একেবারে আশাটাই ছেড়ে দিয়েছে বোধহয়। (বার্থা ওকে সাহায্য করতে যায়) ঠিক আছে, পারব।

ফ্রিডা। ওকে তুমি চুপচাপ রাখতে পারবে না, বিশ্রাম নেয়াতে পারবে না। অবাধ্যতা বাড়ছে। যাকে বেয়াদব বলে আর কি!

লরেন্স। বিশ্রামে আমার উপকার হয় নি, ব্রেট। অনেক তো দেখলাম।

বার্থা। আর একটু তোমাকে দেখতে হবে। আর একটু বিশ্রাম নাও, তারপর তিনজনে মিলে New Mexico পাড়ি দেব।

লরেন্স। তিনজনে মিলে পাল তুলে ছুট। তিনজনে তো—তুমি, ফ্রিডা আর জিভ দিয়ে আগুন চাটতে চাটতে এই বুড়োটা।

বার্থা। (দাড়িটা নেড়ে) আগুন খেকো এই খোকাটা।

লরেন্স। না, দাড়িটা একটু আঁচড়ে নিতে হবে।

[ছোট্ট আয়না। আর চিরুনি নেয়]

ফ্রিডা। ও দাড়ি না আঁচড়ালেই ভাল।

লরেন্স। (আঁচড়াতে আঁচড়াতে) আসলে ফ্রিডা আমার দাড়িটাকে হিংসে করে। সব, সব মেয়েরাই দাড়িতে চটে যায়। বুঝলে ব্রেট, মেয়েদের থেকে ছেলেদের যা কিছু আলাদা করে দেয় তার সবার উপরেই মেয়েদের জন্মগত বিরাগ।

ফ্রিডা। যা বলছ ঠিক তার উল্টো। (চা ঢালে) উল্টোটাই টানে।

লরেন্স। কেমন করে টানে জানো? মেয়েরা পুরুষদের শরীরের ভেতর টেনে নিয়ে বাঁধে। যাতে আর কোনদিন না বেরুতে পারে। ভাবে, এতেই পুরুষদের ভালো হয়।

ফ্রিডা। একজন কুমারী মেয়েকে এসব কেন শোনাচ্ছ লরেঞ্জো?

লরেন্স। যাকগে এতক্ষণ কিন্তু কিচ্ছু বলনি, ব্রেট।

বার্থা। কি বলিনি?

লরেন্স। কি বলেছ? তোমাকে লণ্ডনে পাঠালুম কেন?

বার্থা। যাতে তোমার কাছে থেকে জ্বালাতন না করি।

লরেন্স। সে তো একটা কারণ। (সবাই হাসে) আরে, আমার ছবির কি হোল? সকলের কেমন লাগল? একটা খবর এতক্ষণ চেপে রাখা, ক্ষমতা আছে তোমার ব্রেট! সাবাস!

বার্থা। মানে···

ফ্রিডা। যা বলবার বলে দাও। না শোনা অবধি তোমার নিস্তার নেই। যা সত্যি তা-ই বল।

বার্থা। আমি অন্যরকম বলি না।

লরেন্স। (পিঠে মিষ্টি চড় মেরে) ব্রেট! ব্রেট! ব্রেট! রাগতে নেই ব্রেট! তুমি যে রেগে গেলে এক্সিবিশনের খবরটা এক্ষুনি আর কেউ দেবার নেই।

বার্থা। এক্সিবিশনটা সে একটা তুমুল কাণ্ড হয়েছে বলতে পারো। আমি তো আগেই বলেছিলাম।

লরেন্স। মানে, সকলের দারুন পছন্দ হয়েছে বলছ?

ফ্রিডা। পছন্দ হয়েছে! তোমার ছবিগুলোকে ওরা বিদ্‌ঘুটে, বিরক্তিকর বলে চেঁচিয়েছে!

লরেন্স। একেই কি সফলতা বলে? ওরা বলেছে, আমি আঁকতে জানি না, বাচ্চাদের মতো দাগ টানি, রঙ ছড়াই; আমার ছবি বিদঘুটে, অশ্লীল, দানবীয়, বিকৃত, দুর্বোধ্য, তাই তো?

বার্থা। তুমি নিশ্চয়ই রিভিউ পড়েছ? ঠিক একথা লিখেছে।

লরেন্স। রিভিউ আমি পড়িনি ব্রেট। কিন্তু যারা লেখে তাদের আমি জানি। এ কথাগুলো আমার ছবি আঁকার আগেই লেখা ছিল। সময়মতো ওরা এনে বসিয়ে দিয়েছে। সমালোচকদের কথা ছেড়ে দাও, আর সব দর্শকরা কি বলেছে?

ফ্রিডা। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হেসেছে।

লরেন্স। হেসেছে?

ফ্রিডা। হাসবে না। তাদের কাছে তুমি যে লেখক, চিত্রশিল্পী নও। তাই তুমি একটা সোজা দাগও কাটতে পারোনা। এতো সোজা কথা।

লরেন্স। হ্যাঁ, সোজা লাইন আঁকতে আমি পারি না—কিন্তু বাঁকা রেখা তো পারি, ফ্রিডা। আর এটা পারতুম বলেই বাঁকা-চোরা জীবনটা ছবিতে ফোটাতে চেয়েছিলাম। ব্রেট. কিরকম লোক হয়েছিল? অনেকে দেখতে এসেছিল?

বার্থা। গণ্ডগোলটা হবার পর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। দরজা বন্ধ করে দেবার পর কাণ্ডটা কি জানতে বেশ ভিড় হয়েছিল।

লরেন্স। গণ্ডগোল! কিসের বলো তো?

বার্থা। লেডিজ ক্লাবের একদল সদস্য আদম আর ইভের ছবিটা নষ্ট করতে চেয়েছিল।

[লরেন্স উন্মাদের মত হাসতে শুরু করে, শরীর কাঁপতে থাকে।]

ফ্রিডা। লরেঞ্জো, থামো! থামো বলছি!

[আস্তে আস্তে থামে]

বার্থা। ফলে পুলিশ এল।

লরেন্স। পুলিশ!

[লরেন্স সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গলা তীব্র হয়]

লরেন্স। পুলিশ! ওরা আমার ছবি নিয়ে কি করল? জ্বালিয়ে দিয়েছে? নষ্ট করেছে?

বার্থা। আমরা একটা ইনজাংসন পেয়ে গেলাম। ফলে ওরা ছবিগুলো পুড়িয়ে দিতে পারেনি।

লরেন্স। তাহলে ছবিগুলোর ক্ষতি হয়নি?

বার্থা। ছবিগুলো সব ঠিক আছে লরেঞ্জো।

ফ্রিডা। এবার চেয়ারটায় বোস। নাহলে তোমাকে কিন্তু জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেব।

[ফ্রিডা ওকে চেয়ারে, বসাবার চেষ্টা করে। লরেন্স হঠাৎ জোরে চড় মারে]

বার্থা। লরেঞ্জো!

লরেন্স। গায়ের জোর আছে তোমার তাইনা? শক্তির বড়াই! আমাকে দুর্বল পেয়েছ, তাইনা! এই তো তোমার সুযোগ। গায়ের জোরের সুযোগ! আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেবে? চেষ্টা করে ছাখো—সাবধান, আমার শরীর স্পর্শ করবে না।

ফ্রিডা। লরেন্স।

লরেন্স। চুপ কর।

ফ্রিডা। লরেন্স; চেয়ারটায় বোসো। নাহলে আবার রক্ত পড়তে শুরু করবে।

[লরেন্স খানিক ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বাধ্যের মতো বসে]

লরেন্স। (খুব দুর্বল) শালটা দাও। সূর্যটা বোধহয় এবার ডুবে যাবে। হ্যাঁ, বার্থা ছবিগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল, তাইনা। (শান্ত) ওগুলো খুব দামী ছবি নয়—কিন্তু ওর মধ্যে জীবনের আলোড়ন ছিল, সেটা তো মিথ্যে নয়!

বার্থা। ওরা তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করল। হয়তো তুমি ছবি না আঁকলেই ভাল ছিল।

লরেন্স। কেন আঁকলুম ? লিখে সব বলা যায় না, অক্ষর সবকিছু নয়। রঙ, রঙ দিয়ে অনেক কথা বলা যায়। আমি যেমন করে যা লিখতাম, রঙ দিয়ে তাই করতে চেয়েছি। কোন লজ্জা করিনি। প্রকাশ করতে সাহস চাই। এ এক রকমের আঘাত। ব্রেট, কেবল ভালবেসে এ আঘাত সম্ভব নয়। দুহাতে ঘৃণা এলে দ্বিগুণ শক্তিতে আঘাত করাও একধরনের আত্মপ্রকাশ যেমন করে ফ্রিডাকে না ভালবেসে একেক সময় আমি ঘৃণা করি। এ এক নির্লজ্জ উদ্ধার।

বার্থা। ওরা তোমার ছবি বুঝল না, তাতে নিশ্চয়ই তুমি দুঃখ পাবে না !

ফ্রিডা। লরেঞ্জো, তুমি বড় বেশী কথা বলছ।

লরেন্স। ওরা আমার বই নিষিদ্ধ করেছে, ছবি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছে। এটাই হয়•••প্রখর সূর্যের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়—কিন্তু দেখা যায় না। (জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়) সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সূর্যটা অবশ হচ্ছে। অন্ধকার বেশ্যার মতো সূর্যটাকে লোভ দেখিয়ে আঁচলে ঢাকছে।

ফ্রিডা। সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে ও যা বলে, তুমি শুনোনা বার্থা।

লরেন্স। অন্ধকার সৈরিণী। সূর্যের সমস্ত শরীরটা গ্রাস করছে। এবার সঙ্গম। সূর্য ভীষণ অবসন্ন। ব্যাভিচার ওর সব শক্তি শুষে নিচ্ছে, একটু একটু করে ধ্বংস করবে। সূর্যটা গিলে ফেলছে। আঃ, ওকে হারাতে পারবে না। গণিকার পেটের উপর থেকে ও নেমে আসবে আর তক্ষুনি চারদিকে আলো আর আলো। সব কিছুর শেষে, সব সময় আলো।

[অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়]

বার্থা। লরেঞ্জো !

ফ্রিডা। উঠোনা।

লরেন্স। চুপ ! আমাকে স্পর্শ করবে না। (কোন মতে বড় জানালাটার কাছে যায়) সবশেষে আলো···আর আলো। (কণ্ঠস্বর তীব্র হয়, দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি বাইবেলের প্রফেটের মতো) মহান আলো ! মহান দৃষ্টি আচ্ছন্ন করার মতো আলো। ফুরোয় না এ সব আলো। আর আমি···তার ভবিষ্যৎ বক্তা !

[লরেন্স টলতে থাকে। নিজের মুখ চেপে রক্ত আটকায়]

ফ্রিডা। লরেন্স !

বার্থা। (ভীত) ফ্রিডা।

ফ্রিডা। ওর দুহাতের মধ্যে রক্ত।

বার্থা। লরেঞ্জো !

[বার্থা ওর দিকে এগিয়ে যেতে চায়। ফ্রিডা থামায়]

লরেন্স। আমাকে তোমরা, তোমরা মেয়েরা কেউ স্পর্শ কোরো না। আমি একা মরতে চাই···যতক্ষণ না শেষ হয়ে যাই কেউ নড়বে না !

[ভীষণ মাধ্যাকর্ষণ যেন শক্ত হাতে তাকে একটু একটু করে মাটিতে ফেলে দিতে চায়। লরেন্স প্রাণপণে দেয়ালটা ধরে পতন রোধ করে। কষ্ট করে যেন প্রবল যুদ্ধে জেতার চেষ্টায় দেয়াল আঁকড়ে আঁকড়ে দরজার কাছে যায়। দরজা খুলে ফেলে। ফ্রিডা, বার্থা অনড়]

লরেন্স। তোমরা কেউ আমার পিছনে আসবে না !

[লরেন্স চলে যায়]

বার্থা। (ফ্রিডার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে) আমাকে ছাড়, আমি ওকে একা যেতে দেব না।

ফ্রিডা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। কোন মেয়ে ওর কাছে থাকবে না।

বার্থা। অন্তত তুমি যাও।

ফ্রিডা। কেউ না ! আমি না, তুমি না।

বার্থা। ও কেন একা মরবে। না, তা হতে পারে না, ফ্রিডা—তা হয় না! এতটুকু মায়া যার আছে সে ওকে, এভাবে যেতে দেবে না!

ফ্রিডা। আমি দেব আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

[একটা হাওয়া ওঠে। ফিনিক্সের ছবিটা নড়তে থাকে। বার্থা প্রায় ছুটে যায়। ফ্রিডা ওকে আটকে রাখে। কারুর ধাক্কায় ল্যাম্পটা পড়ে নিভে যায়। বার্থা চেঁচিয়ে ওঠে, মেঝেয় বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিছুকাল চুপচাপ। তারপর খুব মৃদু, যেন দূর থেকে লরেন্সের গলা ভেসে আসে—"ফ্রিডা!" মুহূর্তের মধ্যে ফ্রিডা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দ্রুত বাইরে চলে যায়]

ফ্রিডা। (বাইরে থেকে শোনা যায়) লরেঞ্জো!

যবনিকা

* টিনিসি উইলিয়াম্স-এর 'আই রাইজ্ ইন্ ফ্লেম ক্রায়েড্ দি ফিনিক্স'-এর রূপান্তর।

মাছি

চরিত্র ঃ কালাচাঁদ, বৈকুণ্ঠ, পালান, কালাচাঁদের বৌ, জয়নাল,
বুড়ো, নকুল, চরণ, মানিক, গগন, গগনের বৌ, দারোগা।

[বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর ঘর। পিছন দিকের দেয়ালে কোন পূর্বপুরুষের চিত্র। দুপাশে গণেশজননী এবং শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের ফটো। বৈকুণ্ঠ গ্রামের মাতব্বর মানুষ। একখানা সেকেলে চেয়ার তার বংশ গৌরবের সাক্ষী হিসেবে ঘরের বাঁদিকে। তার কাছাকাছি জানালা সমান উঁচু একটি বনেদি টেবিল। টেবিলটি জানালার ধার ঘেঁষে, টেবিলে বসে জানালা দিয়ে গলিয়ে ছিপ ফেলে বসে আছে কালাচাঁদ। বয়স বছর ত্রিশ হবে। গলায় কম্পর্টার। হাফসার্ট গায়ে। বোধহয় কোনো মাছ আটকেছে। উত্তেজিত মুখ চোখ। হুইলের সুতো ছাড়ছে, গোটাচ্ছে। মেঘ ডাকছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের আলো ঢুকছে ঘরে। পাশে একটি ট্রানজিস্টার তারস্বরে খবর বলে যাচ্ছে।]

রেডিও। অভূতপূর্ব বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দাপটে দেশের জনজীবন ও অর্থনীতি বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অবিরাম ধারাবর্ষণ, বাঁধভাঙা জল· এবং বিভিন্ন নদীর জলস্ফীতির জন্য বহু জেলা প্লাবিত হয়েছে। অসংখ্য গ্রাম জলমগ্ন। অসংখ্য মানুষ বিপন্ন। জলমগ্ন অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকায় উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বন্যাকবলিত……

[কালাচাঁদ ক্ষুব্ধভাবে রেডিও বন্ধ করে মৎস্য শিকারে একাগ্র হয়। মনে হয় বড় রকমের একটা মাছের সঙ্গে তার যুদ্ধ চলছে। ধনুকের মতো বেঁকে গেছে ছিপটা। কালাচাঁদ টেবিলে উঠে দাঁড়িয়েছে।]

কালাচাঁদ। [উত্তেজিত] জ্যাঠা ! জ্যাঠা !!

[কোনো সাড়া নেই। কালাচাঁদ সামলাতে পারছে না।]

কালাচাঁদ। জ্যাঠা গো !!

[বৈকুণ্ঠ হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে। পঞ্চাশোর্ধ বয়স। ভোগে যত্নে থাকার চেহারা। মাছ গেঁথেছে—সে দেখতে পায়। বগলে চাপা বৈষয়িক দলিলপত্র টেবিলে রাখে।]

বৈকুণ্ঠ। গেঁথেছিস্?

কালাচাঁদ। টেবুলে উঠে শীগগিরি কোমরডা জড়ায়ে ধরো। আমারে টেনে নিচ্চে!

[বৈকুণ্ঠ কোনমতে টেবিলে উঠে কালাচাঁদের কোমর জড়িয়ে ধরে।]

বৈকুণ্ঠ। কি জিনিষ গেঁথেছিস্ রে কালাচাঁদ! এমন জোর তো মাছের শরীলে হবার না। জ্যাঠা-ভাইপো দুজনারে টেনে নিলে যে চৌধুরী বংশে বাতি দেবার কেউ থাইকবেনা!···আমার দম হাল্কা হয়ে আসতিছে, হাতের দাবনায় টান সইছে না!

কালাচাঁদ। ···ছাড়া নাই। এ সেই মাছ গো জ্যাঠা।

বৈকুণ্ঠ। কোন্ মাছ?

কালাচাঁদ। ঐ যে গো ঢোল দিয়েছিল—চারমণ ওজনের মাছ, মাছের নাকে সোনার নোলক। এ মনে হচ্ছে এডা সেই মাছ। বন্যায় ভেড়ি থেকে ভেইসে গিছে। যে ধরি দিবে—চার বিঘা জমি পাবে, সঙ্গে দু হাজার ট্যাকা···জ্যাঠা···ও জ্যাঠা, আমার হাত পিছলে ছিপ হড়কে যাচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ। জোর কইরে ধর।

কালাচাঁদ। যা!

[হুস্ করে ছিপ কালাচাঁদের হাত ফসকে জানলা দিয়ে অদৃশ্য হল। আলগা হতে বৈকুণ্ঠ টেবিলে ধপ্ করে বসে পড়ল। একটু লেগেছে তার।]

বৈকুণ্ঠ। শালা, ঢ্যামনা!

কালাচাঁদ। ইঃ! গাল পারে। আমার বলে জেবন বেইরে যাচ্ছিল!

বৈকুণ্ঠ। নাঃ, পাইরবে না! মাছের নামে লবডঙ্কা! ইদিকে আমার হুইলের ছিপটা যে গেল, হারামজাদা!

কালাচাঁদ। (টেবিল থেকে নামতে নামতে) বন্যায় মানুষ, গরু ভেসে যাচ্ছে, আর এট্টা ছিপের জন্যি হুতাশ নেগেছে !

বৈকুণ্ঠ। আরে অ কালাচাঁদ ! বানে ভাসা গরু ছাগল ছিপে গাঁথিস নিতো ? স্রোতের টানে কত সব ভেসে আসচে।

[কালাচাঁদ কথা না বলে চলে যাচ্ছিল]

বৈকুণ্ঠ। কুথায় চললি ?

কালাচাঁদ। আর একখান ছিপ তো আচে। নে আসচি।

বৈকুণ্ঠ। কি পেয়েচিস্ ! ও ছিপে হাত দিবি না !

কালাচাঁদ। কেন ? কত কষ্ট করে পিম্‌রের ডিম যোগাড় করিচি ! আমার অমন সাধের টোপগুলান কি পচে হেজে যাবে !

বৈকুণ্ঠ। পচবে কেন ? পিম্‌রের ডিমের পিণ্ডি পাকায়ে দে— গিলে খাই ! সুখের পায়রা হয়েচ ! বাবুর দোতলার জানলায় বসে মাছ ধরা হচ্ছে ! ইদিকে জল বেড়ে একতলা ছাড়ায়ে দুতলায় উঠবার জো হয়েচে—সে সব খেয়াল কত্তি হবেনা ? সুম্‌সারের জিনিসগুলা বাঁচাতি হবেনা ?

কালাচাঁদ। ও তুমি কিচ্ছু ভেবোনি জ্যাঠা, আমি জ্যান্ত থাকতে কিচ্ছু যাবে না। (জানলার কাছে গিয়ে) ঐ দ্যাখো জ্যাঠা, মাছে কেমন ঘাই মারতিচে।···ওঃ কি দিশ্য, জলে জলাকার ! কে বইলবে যে নীচোয় উঠোন ছেল ! মনে হচ্চে যেন ইস্টিমারে বসে আচি।···ঘরে বসে মাছ ধরা···ওঃ, এমন মৌজ আর হবে কুনকালে জ্যাঠা !

বৈকুণ্ঠ। তোরে নিশ্চিত মেছো ভূতে ধরেছে !

কালাচাঁদ। ঐ দ্যাকো ! বুয়াল মাছটা ঘাই মেরে চিৎ হয়ে ভাসচে ? তার মানে, শরীল আলগা করে ডিম ছাড়তিচে। যাই, ছিপটা নে আসি।

[কালাচাঁদ চলে যায়]

বৈকুণ্ঠ। হারামজাদা, এঘরে যদি ছিপ নিয়ে আসিস্ তো, তোর মাথা ভাইঙ্‌বো আমি। যা করবার ওঘরে বসে করবি।

[বৈকুণ্ঠ চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে কাগজপত্তর নিয়ে বসে। একখানা দলিল খুলে খুঁটিয়ে দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ ডাকে]

বৈকুণ্ঠ। আরে, বারাণ্ডা দে যায় কে? পালান না? কতা শুনি যা!

[পালান ঢোকে। এ বাড়ির ভৃত্য। মেঘ ডাকে]

বৈকুণ্ঠ। জলের সোত যেন বেড়েচে মনে হয়।

পালান। সে তো সমানে বেড়েই চলেছে।

[জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় বৈকুণ্ঠ।]

বৈকুণ্ঠ। কালীবন্ন আকাশ! চান্দিক জমাট! ঐ ম্যাঘখান ভাঙি পড়লে পব্বত পর্যন্ত গলে যাবে—ঘরবাড়ি মানুষজন তো কিছুনা। তা, একতলা ফাঁকা করে সব ওপরে তুলিচিস্ তো?

পালান। তুলচি।

বৈকুণ্ঠ। একটু তাড়াতাড়ি করিস, জল কিন্তু উঁচা হচ্চে।...আর ভেজা ধানগুলা ঘরের মধ্যে মেলে দিয়ে হাওয়া দে শুকুতি বলেছিলাম, কচ্চিস্?

পালান। কালীর মা পাখা কত্তিচে।

বৈকুণ্ঠ। তা, তুমি কত্তিচো না কেন? তোমার হাতে কি বাত হয়েচে?

পালান। আমার শরীর আর দেচ্চেনা।

বৈকুণ্ঠ। কেন? কি হয়েচে?

পালান। চোখে মুকি আঁধার দেচ্চে। গতরে জুৎ নাই। কেমন যেন খেচন দেচ্চে।

বৈকুণ্ঠ। ভেদবমি হয়েচে?

[পালান মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।]

বৈকুণ্ঠ। (শান্তগলায়) তোর ওলাওটা হয়েচে। বাড়ি চলি যা। ছোঁয়াচে রোগ।

পালান। বাড়ি কুথায় যে যাবো ?

বৈকুণ্ঠ। ও সোতে ভেসে গিচে। যা যা চলি যা।

পালান। য্যাকন যেতি চাইলাম, কিছুতে ছাইড়লেন না।

বৈকুণ্ঠ। ছাইড়লে আমারে দেইকবে কে ? খালি নিজের বিপদ-টাই দেখবি ? আমার খাবি আর আমার তুদ্দিনে চলে যাবি—পয়সাগুলান সারা জেবন কি অমনি দিচ্চি ?

পালান। কতো বইললাম, বাবু জল বাড়তি নেগেচে, মোরে একবারের জন্য ছাড়েন ; মাগ-ছেলেডা কোতায় আছে একবার দেকে আসি। ছাইড়লেন না। কুথায় আছে ওরা কে জানে !

বৈকুণ্ঠ। তেমন যদি টান তোমার জলে ঝোঁপ কেটে কেন গেলে না ! তোরে তো আর আমি দড়ি দে বেন্ধে রাখিনি।··· ম্যাঘের যা অবস্থা—দিনরাত্তির ঠাওর হয় না। সুয্যি ডুবে গেছে কখন। যা, বৌমারে বল, পিদ্দমটা ধরিয়ে ঘর দোরে সন্ধ্যা দেখাতি। অনাছিষ্টির সুমসার হয়েছে ! ভূতের বাড়ি ! সাঁঝ গিয়ে রাইত নামে, একটা পিদ্দম না, শাঁখের আওয়াজ না।

[চলে যেতে থাকে পালান]

বৈকুণ্ঠ। আর শোন্ গরুগুলান উপাসে নাই তো ? জাবনা কেটে দিইছিস্ ?

পালান। দিইচি।

বৈকুণ্ঠ। মণ্ডপখান আমার উচা ছেল তাই রক্ষা। নইলে গরু-ছাগল গুলান সব টেঁসে যেত। ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘুঁটের সাঁঝাল দে আয়—অবলা জীব—শীতি কষ্ট পাবে গরুকডা !

পালান। এই শরীলে সাঁতার কেটে মণ্ডপ যাবো ?

বৈকুণ্ঠ। ভগমানের জীবের সঙ্গেও রোষ করিস্? কর! কাউরে কিছু বইলব না আমি!…যা, বিদেয় হয়ে যা। তুনিয়াডা চক্ষুশূল হয়ে যাচ্চে!

[পালান চলে যায়। কালাচাঁদ ঢোকে। হাতে ঝোলানো টিনের একটি বাক্স, কাঁধে গামছা। বৈকুণ্ঠকে এসে প্রণাম করে। মুখ তার গোঁজ, বৈকুণ্ঠ বিমূঢ়।]

বৈকুণ্ঠ। কি হোল? হঠাস করে পেন্নাম করতিছিস্?

কালাচাঁদ। এই শেষ দেখা।

বৈকুণ্ঠ। ভর সন্ধেবেলা কিসব অকথা কুকথা শুরু করেচিস্?

কালাচাঁদ। বাপ-মা মরা ছেলে আমি। কোলে পিঠে করে মানুষ করেচ। পরাণডাও তুমি রেকেচ। এই শরীলের তাবিচ কবচও তুমি নিজের হাতে একটা-একটা করে পরায়ে দিয়েচ।

বৈকুণ্ঠ। তা কি হয়েচে?

কালাচাঁদ। সেই তোমারে চেরকালের মত ছেড়ে চলে যেতে হচ্চে!

বৈকুণ্ঠ। কাণ্ডটা কি হয়েচে বলবি তো।

কালাচাঁদ। তোমার বৌমা এয়েচে ত্বুবচর, আর তুমি আচ আমার জন্মকাল থিকে। সেই তুমার সঙ্গে আমার অধম্ম কত্তি হোল!

বৈকুণ্ঠ। তোর কতা আমার মাতায় কিছুই নেচ্চেনা। হয়েছেডা কি?

কালাচাঁদ। এই বান-বন্যার জল ভেঙে এখন আমারে তু-কোশ সাঁতার কাটতি হবে।

বৈকুণ্ঠ। কেন?

কালাচাঁদ। কাটত্তি হবে আমি পিতিজ্ঞে করিচি। (ক্ষিপ্ত) যদি চৌধুরী বংশের সন্তান হয়ে থাকি—আমি ঝাঁপ দেব। (দরজার দিকে কাকে শুনিয়ে) বেধবা হয়ে বুঝবে কেমন সোয়ামী ছেল—কথার ইজ্জত তার জ্ঞানা ছেল। সে মরদের ব্যাটা, মরদের বংশে তার জন্ম।

বৈকুণ্ঠ। কালাচাঁদ !

কালাচাঁদ। বলতি দেও আমারে। সন্নেসীর মতো চলে যাচ্চি, বুঝেচ। একখান গামছা আর আমার এই কবরেজি ওষুধের বাক্স সম্বল করে চলে যাচ্চি। রাজত্ব ফেলে চলে যাচ্চি, বুঝেচ ?

[দরজার কাছে ঘোমটা টানা একটি বউ এককোণে দাঁড়িয়ে ফোঁপায়—।]

বৈকুণ্ঠ। এধারে তুই দাপাচ্চিস্ আর ওধারে বৌমা ফোঁপাচ্চে, আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা রে !

কালাচাঁদ। তারে এখন বাপের বাড়ির খপর এনে দিতে হবে ! সারা দিনে মুকি অন্ন তোলেনি।

বৈকুণ্ঠ। খপর আনতে তো করালীরে পাটিয়েচি বৌমা, অত চিন্তা কিসির ?

বৌমা। (কাঁদতে কাঁদতে) সে তো কাল গিচে, আজও এলোনি। পথতো মোটে দুকোশ ! শুনিচি সেখানে খুব জল।

[জোরে কাঁদে।]

কালাচাঁদ। করালী কি আর তার বাপের বাড়ি গিছে ? নিজের সুমসার সামলাতে পালিয়েচে। এ বাড়িতে ফের পা ঠেকালি ওরে আমি জ্যান্ত না। পুঁতি তো চৌধুরী বংশের কেউনা, পিতিজ্ঞে রইলো আমার।

বৌমা। সেকানে মানুষ গরু সব ভেসে যাচ্চে। অসুখে মরতিচে।

বৈকুণ্ঠ। দুতলা পাকা বাড়ি তোমার বাপের—অনর্থক চিন্তা করার কি আচে ? যাও ঘরে পিতুম দেকিয়ে অন্নজল করগে ! চিন্তা একটু থাকে—তা সবারই হচ্চে। আমার দেকোনা, এই ভেড়িডা বানের জলে ভেসে গিছে। এই সেদিন মাছের নাল ভেঙেচি—আজ সেই মাছ কোতায় যাচ্চে কে জানে ? জলের টানে জমির দাগ সব এলোমেলো হয়ে যাচ্চে—কাগজপত্তর বের করে

সব দেকেশুনে রাকচি। এ-খন্দের ফল-ফসল কিছুই হবে না। একি যেমন তেমন শোক বৌমা! তবু কেমন মাতা ঠাণ্ডা রেকেচি। কায়দা-কজা করে সবতো আমার রাখতে হবে। কিছুতে ভেঙে পইড়বে না, বুঝেচ?

কালাচাঁদ। কারে কি কচ্চো? এসব কথা কি তারে আমি কম বুঝিয়েচি! মুখ্যুর কি জ্ঞান থাকে? কতবার বইললাম, চোকির ছামুতি জ্যাঠা আচে তার দেষ্টান্তটা নেও ' শোকে তাপে মহাদেব টলতি পারে, কিন্তু জ্যাঠা আমার পাতর। জ্যাঠাইমা মইরলো—চিতায় তোলা হচ্চে তেনারে··· জ্যাঠা আমার চোখ মুছতি মুছতি দারোগা সাহেবের কানে কানে কথা বইললো, বুদ্ধি বাতলালো—সেই বুদ্ধিতেই ত্যাঁতোড়ের ত্যাঁদোড় চাষার ব্যাটা হরিচরণ খুনের মামলায় ফেঁসে গেল, এসব শোনা কতা না—নিজের চোকি দ্যাকা! এসব কতা কারে বোঝাবো, চোকির জলই কমেনা!

বৈকুণ্ঠ। চোকির জল আচে, বান-বন্যার জলও আচে···তাই বলে সব কিছু কি ভেসে যাবে?

বৌমা। আমি কি তারে জলে ঝাঁপ দিতে বলিচি। বলুক সে, এমন কতা বলিচি কি না!

কালাচাঁদ। তা, চাকর বাকর দে না হলে তো আমারেই যেতে হবে। খপর আনতে কি জ্যাঠা যাবে? ফোঁপাচ্চে তো ফোঁপাচ্চেই। এ ঘরে একটু ছিপ নিয়ে বসলাম, সে ছিপটা গেল। ওঘরে পালঙ্কে বসে সবে একখানা ছিপ নে বসেচি। কতা বললে তকরা হবে—বাপু চুপচাপ মাছ মারি। হঠাৎ করে এসে কতা নেই বাত্তা নেই মটাস করে ছিপটা মচকে ভেঙে জানলা দে ফেলে দেল।

বৈকুণ্ঠ। এ ছিপটাও গিচে?

কালাচাঁদ। নাঃ, আস্ত আচে। তোমার এই এট্টা দোষ, সোজা কতাটা বুঝতি ঘামায়ে ওঠো ! আমার কতায় এমন কি ধোঁয়া ছেল যে বুঝতি পাচ্চনা ছিপটা আচে না গ্যাচে ?

বৈকুণ্ঠ। বুঝেচি। দু খানই গেলো ! যাও, একন বৌমারে অন্দরে নে অন্নজল করাও।

কাঁলাচাঁদ। আমার পিতিজ্ঞে ?

বৈকুণ্ঠ। তোমার বকলমে আমি জলে ঝাঁপ দেব। তুমি যাও ;

[বারান্দার দিক থেকে বমি করার শব্দ শোনা যায়। বৈকুণ্ঠ দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দেয়। নাক চেপে মুখ বিকৃত করে ভিতরে আসে। কালাচাঁদ ওদিকে যায়]

বৈকুণ্ঠ। এঁ হে হে হে ! বারাণ্ডাটা আমার গিছে ! ভেদ বমিতে একাক্কার !

[কাঁলাচাঁদ নাক চাপা দিয়ে ফিরে আসে।]

কালাচাঁদ। কোঁৎ কোঁৎ করে গরু-ছাগল পচা জল গিলেচে। ঘরে তো মহামারী ছড়াবে !

বৈকুণ্ঠ। পালান আমার সুম্‌সারটারে না শ্মশান করে তোলে।

কালাচাঁদ। সময় থাকতি ভেলা করে ভাসান দিয়া দরকার।

বৌমা। ওডারে আবার ধরতি ছুঁতি যেওনি। ছোঁয়াচে ব্যাধি —ঝাড়েবংশে মারে।

[হঠাৎ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় পালান। কলেরায় আক্রান্ত চেহারা। ওর দিকে তাকিয়ে ওরা ভয় পায়]

পালান। আমি যাবনি। এখন আমার জন্যি ভেলা আসে, মান্দাস আসে। য্যাকন মাগপুত ভেসে যায় ত্যাকন দরদ ছেলে কোথায় ? আমি যাবনি।

বৈকুণ্ঠ। মত্তি বসি দাপট ফলাচ্চিস !

কালাচাঁদ। না যাস, বাঁশের খোঁচা দে তোরে জলে ফেলে দুব।

পালান। সারা জেবনঠাইতো খোঁচাচ্ছেন। সারা গ্রামটারেই খোঁচাচ্ছেন ! জানতি বাকি আচে কিচু।

বৈকুণ্ঠ। চোপ্।

পালান। সারা জেবন চুপ থেকেচি, মইরবার আগে ভয় কারে। বাপ দাদার সর্বস্ব গিলেচ, আমারে চাকর করেচ—এখুন খোঁচায়ে জলে ফেইলতে চাও। আমি যাব না। খোঁচাও, য্যাত পার খোঁচাও।

[বারান্দার দিকে সরে যায় পালান।]

বৈকুণ্ঠ। গাল ভর্ত্তি বিষ নে ছেল এতদিন হারামজাদা। নেমক হারামীর শাস্তি দেচ্চে ভগমান বুঝেচিস্। থাক পড়ে ওখেনে। কথা শুনলি চিতার আগুন মাথায় উঠে আসে।

কালাচাঁদ। তোরে শকুনে ছিঁড়ে খাবে। শেয়ালের ভোজন হয়ে যাবি। মাথায়ে শেষ কত্তি হয় এসব কেউটের জাত।

বৈকুণ্ঠ। যাও বৌমা, অন্দরে থাকো গে। বারাণ্ডার ধারপাড় মাড়াবে না।

কালাচাঁদ। এখন তো ভালো, জল সরে গেলে পুরা গাঁটাতেই মহামারী লেগে যাবে। মড়কের আগুন জ্বইলবে।

বৈকুণ্ঠ। হা-অন্ন হা অন্ন করে মানুষ জানোয়ার হয়ে উঠবে। মহা বিপদ শিয়রে।

বৌমা। আমার ভয় কত্তিচে।

বৈকুণ্ঠ। একটা কাম কর গে। গোলার চাল্ আমি আগেই সরিয়ে ফেলেচি। কিন্তু ঘরের মজুতও কমনা। ঘরে বালিশ তোষক লেপ যা আচে সবগুলার ভেতর থে তুলা বের করে ছালার চাল ভেতরে ঠেসে দাও। তাছাড়া চাল লুকোবার আর জায়গা কোথায়। বলা যায় না—ঘরের মধ্যে এসে যদি চড়াও হয়।

বৌমা। আর গয়নাগাঁটি ?

কালাচাঁদ। ট্যাকা-পয়সা ? মাটি খুঁড়ে রাইখবো তারও তো জো নেই। জলে জলাক্কার সব।

বৈকুণ্ঠ। থাইকবে সব সিন্ধুকে। ওটা ভাঙে তো কপাল ভাইঙলো! আর করা কি? যা বললাম করো গে। আমি এই দলিল পরচাগুলানো একবার চোখ বুলিয়ে হাত নাগাচ্চি।

[ওরা দুজনে চলে যায়। বৈকুণ্ঠ কাজে মন দেয়। বারান্দা থেকে পালানের বমি করার আওয়াজ আসে। মেঘ ডাকে। একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। বৈকুণ্ঠ কান পাতে। কালাচাঁদ ঢোকে। মুখে ত্রাস। হাতে টর্চ।]

কালাচাঁদ। জ্যাঠা।

বৈকুণ্ঠ। কি রে?

কালাচাঁদ। জলে লগি ফেলার আওয়াজ হচ্ছে।

বৈকুণ্ঠ। কানে গিছে আমার।

কালাচাঁদ। (জানলার দিকে তাকায়) মনে হচ্ছে, ভেলায় চেপে ইদিক পানে মানুষ আস্‌চে। টর্চ ফেইলবো? চাদ্দিক বড় আন্ধার।

বৈকুণ্ঠ। টর্চ ফেলে কাম নাই।

[বাইরে থেকে হাঁক শোনা যায় "কত্তাবাবু, কত্তাবাবু"।]

বৈকুণ্ঠ। কারা যায়?

নেপথ্য। যাচ্ছি না—সব ফেলে ঝেলে আপনার দুয়ারে ঠাঁই নিতে এইচি।

[বৈকুণ্ঠ জানলার কাছে যায়।]

বৈকুণ্ঠ। (ঝুঁকে) আমার দুয়ার বইলতে কি আর কিছু আচে! জলে ভেসে আচি।

নেপথ্য। এট্টুস্ ঠাঁই না পেলে তো বাঁইচবনা।

বৈকুণ্ঠ। ঐ পিছনের দিকে চলি যা। কালাচাঁদ টর্চ দেখাচ্ছে। সিঁড়িটা মালুম করে উঠে আয়।

[জানলার কাছ থেকে বৈকুণ্ঠ চলে আসে।]

বৈকুণ্ঠ। যারে কালাচাঁদ, আলোটা দেখা।

কালাচাঁদ। আপদগুলানরে আদর করে ঘরে তুলছ?

বৈকুণ্ঠ। সবসময় কি খেঁটের বাড়ি মেরে কাম হয়! এসময় এট্টু না করলে চলবে? যা। ওদের আলো দেখিয়ে চাল গুলোগে লেপ তোষকে ঠাস।

[কালাচাঁদ চলে যায়। বৈকুণ্ঠ কাগজপত্রগুলো গুছোয়। দ্রুত চেয়ারে উঠে পূর্বপুরুষের তৈলচিত্রটির আড়ালে লুকিয়ে ফেলে। ওদিক থেকে লোকজনের দুতলায় উঠে আসা সংক্রান্ত কথাবার্তা ভেসে আসে। বৈকুণ্ঠ চেয়ার থেকে নামে। দরজা দিয়ে কয়েকজন চাষী ঢোকে। একজন থুত্থুরে বুড়োকে দুজন পাঁজাকোলা করে এনে বসিয়ে দেয়। বুড়ো দলা পাকিয়ে বসে কাশতে থাকে। মুখ চোখ দেখা যায় না।]

বৈকুণ্ঠ। ওটা কে?

জয়নাল। আমাদের ক্ষেত্তর, তার বুড়া দাতুডা।

[বুড়ো মুখখানা তোলে। জুলজুল করে তাকায়।]

বৈকুণ্ঠ। এবেরে মালুম হচ্চে।

[বুড়ো মুখের কাছে হাতের আঙুল জড়ো করে নাচায়।]

চরণ। জোর ক্ষিদে লেগেছে—মুকি বাক্যি সরে না এখন।

নকুল। পিথিমি ডুবে আছে।

চরণ। শরীল কাঁপে—আজ চাদ্দিন এট্টা দানা পড়েনি পেটে।

জয়নাল। পানিতে তুনিয়া ছয়লাপ হয়ে আছে। হারাউদ্দিশ মানুষ যে যেখানে এট্টু উঁচা পাচ্চে উঠে আচে।

চরণ। মাটির ঘর কাদা হয়ে গিছে। সোতে মরা মানুষ গরু ভেসে যাচ্চে।

নকুল। য্যাত ঝড়-ঝাপটা এই বুনা কাটার আগে।

চরণ। গোদের উপর বিষ ফোঁড়া ব্যারেজটাও ভেঙে গিছে—জল ধেয়ে আসছে।

বৈকুণ্ঠ। কে কোথায় উঠছিস্?

জয়নাল। ইস্কুল বাড়িতে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা আচে সব।

মানিক। বোড-রাস্তায় দাঁইড়ে আচে অগুন্তি মানুষ।

চরণ। পাকা বাড়ি যা ছেল কেউ কেউ সেখানে উঠেচে।

জয়নাল। গাছে চড়ে আচে কতজন দেখেন গে।

নকুল। পেরাণডা যাদেরও বা আচে ক্ষিধার কামড়ে মরে ঝরে যাবে সব।

জয়নাল। কত্তাবাবু, এট্টু খাওয়ার যোগাড় না হলি যে হচ্চে না। মাতা আর তোলা যাচ্চে না।

চরণ। লাগে য্যান ভিড়মি খেয়ে পড়ে যাব।

বৈকুণ্ঠ। তা, এখানে খাবার মিলবে বলে এয়েচিস্?

মানিক। ইখানে না মেলে তো কুথায় মিলবে?

বৈকুণ্ঠ। এখনতো যার আছে আর যার নাই সকলের সমান অবস্থা। তোদের চেয়ে চাড্ডি পয়সা আমার বেশি আচে। কিন্তু গেরামের মানুষের অন্নতো সিন্ধুকে নাই। পয়সা চিবিয়ে তোরাও বাঁচবি না, আমিও বাঁচব না। ঘরে এসে উঠিচিস্, থেকি যা।

চরণ। আমনি হচ্ছেন গরীবের মা বাপ—

বৈকুণ্ঠ। এখন বলচিস—কিন্তু মনে বলে অন্য কথা। আমার পাকা বাড়ি—আর তোদের খড়-মাটির ছাউনি। এই ফারাকটা আছে বলে কত বাপান্ত করিস মনে মনে। কিন্তু এই উঁচা বাড়িটা বেপদের দিনে তোর পেরানডা বাঁচায় না? এই যে এয়েচিস্—তোদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় কচ্চি? ভগমান বেপদ ডেকে আনে কি জন্যি জানিস্—তোর আমার চোখ ফোটাবার জন্যি।

[কালাচাঁদ একটা বস্তা নিয়ে ঢোকে।]

কালাচাঁদ। টিন ঝেড়েঝুরে দেকি দু চার পালি মুড়ি আচে। দু কচা করে সবাই গলে দিলে কিচুতো হবে।

বৈকুণ্ঠ। ওঘর থেকে ওদের দুঃখের কথা সব শুনছিলি বোধ করি।

কালাচাঁদ। বান-আকালের দিনে কি আর কিছু শুনতি লাগে

জ্যাঠা? ও হুক্যু ভিতর থিকে আপনিই উথলি বেরোয় (বুড়োকে) নাও ধরো।

বৈকুণ্ঠ। দে, দে, বুড়াডারে এক কৌটো বেশি দে।

কালাচাঁদ। দাঁত আচে?

[বুড়ো দাঁত দেখায়।]

নকুল। ছোটবাবুর আমাদের পেরাণে দয়ামায়া আচে।

বৈকুণ্ঠ। তা আচে ওরে, আমিতো চলে যাব। আমার দিনতো শেষ হইয়ে এলো। তোদের দেখতি শুনতি এই ছোটকত্তা থাকবে, দয়ার শরীর পেয়ে য্যান উজাড় করে দিস্ না।

মানিক। মুড়িতে কামড় দে ক্ষিধাটা য্যান লকলক করে উঠচে।

চরণ। বাল-বাচ্চা মেয়েমানুষগুলাতো দুকচা মুড়িও পাচ্ছে না।

জয়নাল। দু কচা মুড়ি খেয়ে কি আর বাঁচন যাবে। হিল্লে এট্টা কত্তি হবে।

নকুল। ক্ষিদেয় আমার নাড়ি ছেঁড়ার জো হয়েছিলো গো।

মানিক। এবার যে এক ঘটি জল খাবো তারওতো উপায় নাই। ভেদবমি শুরু হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ। যাবে কিরে? পালানের তো শুরু হয়ে গিচে।

চরণ। আমাদের পালান?

কালাচাঁদ। ঐ জল গিলেচে—ওলা বিবির দয়া হবে না?

বৈকুণ্ঠ। ঐ তো বারাণ্ডায় শুয়ে আচে।

[ওরা দু একজন কাছে যায়।

নকুল। পালান, পালান রে—

[পালান গোঙায়]

জয়নাল। ভেলাতো ছেল। কিন্তু চিকিচ্চের তো কিছু নাই।

মানিক। পালান, কাঁধে মাথাডা হেলায়ে দে, দেকি ডাক্তারবাবুর কাছে গেলি যদি কিছু হয়।

কালাচাঁদ। ডাক্তারের কাছে গিয়ে আর কি হবে। ডাক্তারের

একতলা ঘর। এ দুর্যোগে কারুর কিছু ঠিকানা আছে। ডাক্তার স্থাকোগে পরিবার নে কঁ্যাটাল গাছে চড়ে আছে। ওষুধ পত্তর সব বানের জলে ভেসে গিছে।

[বারান্দা থেকে পালানের চিৎকার শোনা যায়। "আমি যাব না। ইখানে মইরবো।" ওরা ছুটে যায়।]

চরণ। আরো কজনের হয়েচে।

বুড়ো। জলটা সরে যাক্। ঘরে ঘরে মরণ। মড়া ডিঙিয়ে যাবি। বেঁচে থাইকবো। লাতির লাতির বে দেখে গ্যাঁজায় টান মেরে লাচতে লাচতে মইরব।

[গাঁজার কলকে বার করে।]

জয়নাল। একন গাঁজা খেলে মরে যাবে।

বুড়ো। অ্যাদ্দিন মরেচি? আকালে আমারে মাইরবে? ছোটকত্তা আগুন স্থাও।

নকুল। তোমার লাতির পুত এসে মুয়ে আগুন দে যাবে বুঝেচ?

[বুড়ো নকুলকে লাথি মারে।]

বৈকুণ্ঠ। ঘাটে এসে বয়স ঠেকেচে তবু গ্যাঁজা চাই!

জয়নাল। মুড়িডা চিবিয়েচে অমনি গ্যাঁজার নেশা চেগে উঠেচে।

চরণ। শুনেচি, সকালে গ্যাঁজার দম পেটে ঢুকিয়ে সাঁঝের বেলা ধোঁ ছাড়তো।

নকুল। গ্যাঁজা পেলে দুনিয়া ভুলে যায়। মনে কোন কূটবিক নাই। একটা দম টাইনতে পেলে কাম করে যেত গরু মোষের মতো। আর গ্যাঁজা না জুটলে খিটকেল হয়ে যায়।

কালাচাঁদ। এই আকালেও গ্যাঁজার সরঞ্জাম সব আচে দেকচি।

মানিক। ও ছাইড়বে না। সব্বক্ষণ ট্যাঁকে গোঁজা। (আগুন দেয়) এট্টা কাঠিতে জ্বালাবে। দেশলাই-এর আকাল চইলছে।

[বুড়ো গাঁজার দম দেয়।]

বুড়ো। আকালের ফুটানি। ধোর শালা, বলে আকালে আমারে কি কইরবে রে? আমার কি আচে যে ভেসে যাবে? মাথা গোঁজারডা? ওটুকুর জন্য জেবনপাত কত্তি হবে?…গ্যাজা খা—বুঁদ হয়ে যা। খচ্চরের জাত নিপাত হলে ধোঁ ছেড়ে চোখ চাইবি। তার আগে না।

[দম নিয়ে বুঁদ হয়ে যায় বুড়ো। হঠাৎ ধোঁয়া ছেড়ে জুলজুল করে তাকায়। সোজা তাকিয়ে থাকে বৈকুণ্ঠর দিকে।]

খচ্চরডাবে আমি দেখতিচি।

[বৈকুণ্ঠ অস্বস্তি বোধ করে।]

জয়নাল। এই চাচা চুপ যাও, চুপ যাও। মাথাডা আজকাল বেতাল হয়ে থাকে। আবোল তাবোল বকে।

[আবার দম নেয় বুড়ো।]

বৈকুণ্ঠ। তা তোমরা এখানে খিকে জিরোন করো। আমি অন্দরে যাই।…সামনে বড় পূজো, তার আগে কি কাণ্ডটা হয়ে গেল ত্যাখ। ধানের মড়াই, খড়ের পালুই, ভেড়ি, ক্ষেত-খামার কিছুই থাইকল না।

মানিক। ভুঁইচষা, বীজপোঁতা, কাদা করা, চারা রুয়া—এত গতর-খাটা কাম সব জলে ধুয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। (ওঠে) সবই অদেষ্ট! মনুষ্যের জেবন—এই আচে, এই নাই। চলরে, কালাচাঁদ।

[হঠাৎ বাইরে থেকে মেয়েলি গলায় একটা আকুল চিৎকার শোনা যায়—"ও নিতে, নিতে রে! কোথায় গেলি রে, নিতে।" সবাই উৎকর্ণ হয়। জানলার কাছে যায়। বৈকুণ্ঠ যেতে যেতে থমকে যায়।]

জয়নাল। (হেঁকে) অ, গগন কি হোল রে?

গগন। (নেপথ্যে) ছেলেডার খোঁজ নাই।

নকুল। ইস্কুল বাড়ি, রোডরাস্তা দেখেছিস্?

গগন।　কুথাও পালাম না।

[গগনের বউ পাখির চিৎকার ভেসে আসে—"নিতেরে, কুথায় গিলিরে নিতে।"]

বৈকুণ্ঠ।　এসব শুনলি বুকটা আমার কেমন করে। চল্‌রে, কালাচাঁদ।

[কালাচাঁদসহ প্রস্থান।]

মানিক।　ওপরে উঠি আয়। ভেলায় দাঁইড়ে বউটা আছাড়ি-পাছড়ি কত্তিছে—কি থেকে কি হয়ে যাবে! ওরে এখানে নে আয়। তোর সাথে আমরা খুঁজতি যাবখন। উঠি আয়। হ্যাঁ আয়—পিছনে যা।

[মানিক পথ দেখাতে যায়।]

চরণ।　ছেলেডা সোতের টানে ভেসে যায়নিতো?

জয়নাল।　বলা যায়না। ছুটো ছেলা—সাঁতার কাটার বয়সওতো না।

[ক্লান্ত, আলুথালু পাখিকে নিয়ে গগন ঢোকে। সঙ্গে মানিক।]

নকুল।　কোতায় ছেল তোর বাচ্চা?

গগন।　মাঠে।

নকুল।　দেখ্, হয়ত জল আসতি কেউ তুলে নে গেচে।

গগন।　কে নেবে? কারে শুধোতে বাকী রেকেচি। তারে মা গঙ্গা নেছেরে, মা গঙ্গা নেছে।

[পাখি কেঁদে ওঠে। গগন ধরে বসায়।]

গগন।　এখন আর কাইন্দবারও শক্তি নাই। শোকের ঝাপ্‌টা তার সঙ্গে প্যাটের ক্ষিধা—আজ পাঁচ দিন।

চরণ।　ভালো করে বসাও ওরে।

গগন।　পাখি, ও পাখি বস এখানে। দিয়ালটাই পিঠ দে।

[পাখি প্রায় অবশ। দেয়ালে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে এগিয়ে থাকে। বুড়ো ধোঁয়া ছাড়ে। তাকায়।]

বুড়ো। ওরে খেতি দে কিচু।

জয়নাল। কি আচে যে দেব।

মানিক। তোমার গ্যাঁজা খাবে?

বুড়ো। এ ঘরে আছে।

নকুল। আছে তো তার আছে।

বুড়ো। কিছু না খেলি মেয়েডা মইরে যাবে।

গগন। সবাই তো ধুকতে লেগেচে। ইস্কুল বাড়ি গেলাম বাচ্চাডারে খুঁজতি, পালাম না। আমারডা নাই। কিন্তু যাদের গুলান আছে সে গুলানও আর বেশিক্ষণ নাই, নিথর হয়ে যাচ্চে সব। কাইন্দবার শক্তি নাই। হাত পা নাড়ে না। 'খাব'—এ কথাডা বলার জোরও পাচ্চে না। যমপুরী হয়ে যাচ্চে গাঁটা। হায়রে মা দুর্গা তোর পূজার আগে এ কি করলি মা।···তোমরা আমার পাখিরে দেকো—আমি আর একবার বাচ্চাডারে খুঁজে আসি। আর এর মধ্যে বউডা মরলি—জলে ভাসিয়ে দিও।

বুড়ো। কুথা যাস্‌রে? বাচ্চা যদি কেউ তুলে নিয়ে থাকে তো আচে, না হলি সোতের টানে তোর আমার নাগাল ছাড়ায়ে গিচে। হুতাসে কোন ফল নাই। বউডারে বাঁচা! যেটুকু আচে ধরে রাখ।

গগন। যেকানে আচে সেখান থিকে এনে বাঁচা।···এঘরে আচে।

[দরজার কাছে মৃতপ্রায় পালান এসে দাঁড়ায়। কোন মতে দরজাটা ধরে দাঁড়িয়েছে।]

পালান। আচে, এঘরে আচে, লেপের মধ্যে, তোষক, বালিশ সব কিচুর মধ্যে শুদু চাল আর চাল। ঠাকুর ঘরে চালের বস্তার পাহাড় হয়ে আচে, তিন তলায় চলি যা, তেনারা খাচ্ছেন। সরু চাল, সর বাটা ঘি খাচ্চে।

[পালান চলে যায়।]

বুড়ো। খাচ্চে। চালের পাহাড়ের উপর বসে খাচ্চে। তোরা মরতি মরতি গ্যাখ., মড়া বাচ্চা কোলে নিয়ে গ্যাখ., মড়া বৌ পাশে রেখে গ্যাখ. আর আমি গ্যাঁজার দম দেলাতির লাতির বের বাজনা শুনি।

মানিক। সোজা কত্তার কাছে গে বলি চাল গ্যান। মানুষ মরে!

বুড়ো। অমনি কত্তা তোরে বস্তার মুখটা খুলে দেবে। কাঁড়ি কাঁড়ি বয়েস হয়েচে—কম দেকিচি।

জয়নাল। তালি কি বলো—লুটে নেব?

বুড়ো। আমি গ্যাঁজায় দম দিচ্চি। খচ্চরের নিপাত হলি ধোঁ ছাড়বো। চিতার ধোঁ।

[বৈকুণ্ঠর গলা খাঁকারির আওয়াজ শোনা যায়।]

মানিক। আসচে শালো!

[বৈকুণ্ঠ একটা লণ্ঠন হাতে ঢোকে। পাখিকে দ্যাখে। শোকতাপেও যৌবন সুস্পষ্ট। লণ্ঠন নিয়ে পাখির কাছে যায়। গগনের দিকে তাকায়।]

বৈকুণ্ঠ। জ্ঞানগম্যি লোপ পেয়েচে বোধ করি। তাকালি আমার বুক পোড়ে। বাচ্চার খবরতো নাই? (গগন মাথা নাড়ে) রান্না ভাত ছিল চাড্ডি। তোদের কথা ভেবে মুখি তুলাতি পারলামনা। (পাখির কাছে যায়, চিবুকটা তুলে ধরে।) শরীল যে লড়বড়ে বাঁশ পাতা হয়ে আচে! আহারে, পিত্তিমের মতো মুখ, তার কি কপাল দেখো। (মাথায় হাত বোলায়!) হ্যাঁরে মেয়ে, খাবি? হাঁড়িতে চাড্ডি পড়ে আছে, খাবি? (পাখি তাকায়।) খাবি? (হ্যাঁ জানায়) ক্ষিধা কেমন বস্তু দেখলি তো? শোকতাপ জয় করে ক্ষিধা হাঁ মেলে থাকে।

চরণ। বৌডার যা হালগতিক দেকচি—চাড্ডি পেটে না পড়লে পেরানে বাঁচবে না।

বৈকুণ্ঠ। তোরাওতো উপুসি! তোদের চোখের ছামুত্তি ওর খাওয়াটা ঠিক না। তাই ওরে আমি ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। (পাখিকে) আয় আমার সঙ্গে ভিতরে আয়, তুই খাবি! তোরে ভাত খাওয়াতে নে যাচ্ছি। ওঠ, উঠে পড়!

[পাখি ভাতের কথায় যেন নতুন বল পায়। হাতে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে। বৈকুণ্ঠর বাঁ হাতে লণ্ঠন ডান হাতে পাখিকে ধরে ধীরে এগুতে থাকে। বাইরে থেকে কার গলা ভেসে আসে; 'বৈকুণ্ঠ বাবু।']

বৈকুণ্ঠ। কে?

নেপথ্য। গলা শুনেও চিনতে পারছেননা মশাই? জানলার ধারে আসুন।

[পাখি সমেত জানলার কাছাকাছি দাঁড়ায় বৈকুণ্ঠ। লণ্ঠনটা উঁচু করে বাইরে তাকায়।]

বৈকুণ্ঠ। দারোগাবাবু। নৌকা করে, এ সময়?

দারোগা। (নেপথ্য) আমাদের কি আর সময় আচে? খবর গেল, পুরকাইতবাবুদের গোলা লুট হয়েচে।

বৈকুণ্ঠ। গোলা লুঠ হয়েচে?

দারোগা। একবার যেতে হয়। বন্ধু মানুষ, দুর্দিন বলে তো এড়িয়ে গেলে চলবেনা। (বাইরে থেকে টর্চের আলো ফেলে) কে?

বৈকুণ্ঠ। এখানে ঠাঁই নিয়েচে, গগনের বৌ-পাখি।

দারোগা। পাখি? ডানা কাটা? (দারোগা হাসে) ফেরৎ পথে হয়ে যাবোখন।

বৈকুণ্ঠ। আসবেন।

[বৈকুণ্ঠ পাখিকে নিয়ে দরজার বাইরে চলে যায়। এ ঘরে আলোছায়ায় মানুষগুলো বসে।]

গগন। সুমুন্দির পোর এত দরদ আমার সুবিধার ঠেকেনা।

চরণ। কোথায় নে যায় ছ্যাখ।

[গগন দরজার কাছে লুকিয়ে দাঁড়ায়।]

গগন। বারান্দা দে পাশের ঘরখানে ঢুকলো।

জয়নাল। এগিয়ে গে ছ্যাখ।

[গগন পা টিপে টিপে যায়।]

মানিক। বুড়োর ভীমরতি ধরেনিতো। নজর আমার ভালো মনে হচ্ছিল না।

[গগন আসে।]

গগন। পাখির সামনে সত্যি সত্যি ভাতের থালা রেখেছে।

নকুল। খাচ্চে ?

গগন। থাবায় থাবায় খাচ্চে। যেন হুতাশে খাচ্চিলো। ও মনে হয় জ্ঞানে নাই। (দরজার কাছে যায় গগন। বাইরে তাকায়।) লণ্ঠনটার পলতে একটু নামিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। ঘরের আলো কমেচে।···আরো কমলো ! লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়েচে। (তীব্র গলায়।) কত্তাবাবু !

[গগন ছুটে অদৃশ্য হয়, পাখির চিৎকাব শোনা যায়। মানুষগুলো উঠে দাঁড়ায়। সবাই ছুটে যায়। ঘরে একা বুড়ো দরজার দিকে মুখের ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে থাকে। ওরা ঢোকে। পাখি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। অস্বাভাবিক তার চোখমুখ।]

গগন। ভাত খেলি ? কেমন ভাত খাওয়াচ্ছিলো তোরে অ্যাঁ ?

চরণ। ধমকাও কারে ? মাথার ঠিক আছে তার।

গগন। সুমুন্দির পোরে ধরতি পারলে নলিডা ছিঁড়ে নেতাম। আর এখন দরজা দে তিনতলায় উঠে খিল দিয়েচে। আমি জানতাম শালোর কুমতলব আচে।

জয়নাল। অন্যের টোপ ফেলে শিকার ধরচো। তোর ঐ অন্ন আজ সব লুটপাট করে নেবো।

বুড়ো। পুরকাইতের গোলা লুঠ হয়েচে।

মানিক। এ ঘরে য্যাত চাল আচে—সব নেব।

নকুল। পাপের ধন লুটে নিলে পাপ নাই।

জয়নাল। আজ রাইতটা যেতে দাও। দারোগা সাহেব ঘুরে যাবে বলল। ভোর হতে দাও।

চরণ। দিনের আলোয় মাল পাচারেও সুবিধে হবে।

গগন। তবে সুমুন্দিরে আজ পেলে আমি ছাইড়বনা। রাতভর অপেক্ষা করা চলবে না আমার।

বুড়ো। তোর বউ-এর গায়ে হাত দিয়েচে। তুই তারে ছাড়বি না। আর তার চালে হাত দিলে সে তোরে ছাইড়বে?

জয়নাল। এ চাল তার না।

মানিক। আমরা গতর খেটে তার খামারে তুলেচি।

চরণ। সুদ-দাদনের দায়ে জুলুম করে নিয়ে নিয়েচে।

নকুল। সোজা কম্মটা করলে দোষ কি? সুমুন্দির পো য্যাদ্দিন বাঁচবে খালি মাইরবে। ও শালোরে আজ জলে চুবায়ে মাইরবো।

জয়নাল। জানে মারে যে তারে মাইরতে পাপ নাই। সারা গেরাম খানারে চিবায়ে খাচ্চে। এবার অরে খাবো।

গগন। আমার হাতে অর মরণ। অর নলিডা আমার হাতের মুঠায় চেখে জলে বুড়ায়ে দেব শালোরে।

মানিক। আজ রাতটা যেতে দাও, কাল দিনের বেলা ব্যবস্থা কইরবো।

[ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। পাখি পাখালির ডাকে মঞ্চে ভোর হয়। মানুষগুলো চুপচাপ বসে।]

বুড়ো। একটা রাতে সব ঠাণ্ডা মেরে গেলি? রক্তের গরম জুড়ায়ে গেল!

জয়নাল। থানার দারোগা বসে আছে তার ঘরে। কেমন করে কি কইরবো!

বুড়ো। আজ থানার দারোগা, কাল বাবর বন্দুক। পরশু ভবিষ্যতের চিন্তা। গগন, নলিডা ধরবার দিনক্ষণ যে আর দেখচিনারে।

গগন। একটারে মারলে দশজুনার জেবন যে বরবাদ হয়ে যাবে। তার জোর বেশি।

বুড়ো। গাঁ শুদ্ধা মানুষ এক জায়গায় হলিও তার জোর বেশি ?

জয়নাল। গাঁ শুদ্ধা মানুষ এক জোটেতো নাই।

বুড়ো। একরাতে সব ঠাণ্ডা মেরে আচিস্? রক্তের গরম জুড়ায়ে আচে।

চরণ। ঠুঁটা মানুষ আমরা। সাধ হয় শোধ নিতি। আগুনডা বুকের মধ্যে লাগায়, খালি লাফায়।

বুড়ো। তালি আর ইখানে কেন ? এখান থেকে চল। আমারে তোল। চল্, জলে নেমে পড়ি। বানের জলে আগুনডা নেভায়ে বউ বাচ্চাগুলার মড়া শরীল খুঁজতি যাই।

[ওরা যেতে যায়, দরজার কাছে পালান এসে দাঁড়ায়।]

পালান। যাবার আগে শুনি যাও।

গগন। কি ?

পালান। বড়কত্তার কাল রাইত থেকে ভেদবমি হচ্চে। আমি এখনো বেঁচে ! সে সুমুন্দির পো যায় যায়। করালীর মা বলে গেল। শ্বাস উঠেচে !

জয়নাল। তাই দেখি ঘর থমথমে। ছোটকত্তা ছুটোছুটি করে। দারোগার নৌকায় বোধকরি ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছিলো।

[উপর থেকে কান্না ভেসে আসে।]

পালান। সুমুন্দির পো শেষ হয়ে গেলো ! ···বড়কত্তা, আমি কিছু কত্তি পারলামনা। কিন্তু আমার ভেদবমির উপর যে মাছিডা বসে ছেল সে তোমারে অন্ন ছুঁয়ে মাইরলো !

বুড়ো। পাঁচজনে যা পারলিনা এট্টা মাছি সেকম্ম হাঁসিল করে দিলো ! মান্ষের জোর একটা মাছির চেয়ে কম হয়ে গেল ?

বাইরের দরজা

[পর্দা উঠলে একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বড় আয়নার মুখোমুখি মঞ্জুকে দেখা যাবে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তারুণ্য মঞ্জুর চোখেমুখে। মার্জিত চেহারা। হঠাৎ মঞ্জু নিজের প্রতিবিম্বের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। মাইক্রোফোনে মঞ্জুর গলাতেই রহস্যময় যে কয়েকটি কথা ভেসে আসে—]

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর। মঞ্জু, আয়নায় নিজের ছায়াটিকে অত করে কি দেখছ? যেন তুমি নও, আর কেউ। তোমার মনের মধ্যে থেকে যেন ও লুকিয়ে আয়নার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, তাই না? ও তোমার সঙ্গে আজ নতুন খেলা খেলবে তাইতো? তুমি রাজি না হলেই পারতে। দেখছনা, ছায়াটা কেমন অদ্ভুত হাসছে, যেন একটা বিপদের খেলায় তোমাকে চোখের ইশারায় ডাকছে। মঞ্জুও ঘরের চড়া আলোটা নিভিয়ে মৃদু নীল আলোটা জ্বালো] ও তাহলে তুমিও খেলাটা চাও। বেশ। মঞ্জু, এতবড় বাড়িটায় কেবল তুমি একা জেগে আছ। একতলার বাইরের দরজাটা এত রাত্তিরে এখনো খোলা রেখেছ, তাই নয়? (মঞ্জু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায়) ঐ বাইরের দরজা দিয়ে এত রাত্রে কেউ আসুক। তাই চাওতো? কে আসবে— কমল খুব সাহসতো তোমার! (মঞ্জু মিষ্টি হাসে)। মঞ্জু, গ্যাখো আয়নায় তোমার ছায়াটা জানলার দিকে যাচ্ছে বোধহয় কমল আসছে। জানলার কাছে যাও। কমল আসছে।.....

[মঞ্জু প্রায় দৌড়ে জানলার কাছে গেল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কিন্তু জানলার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে

এল। ওর মুখে সুখ, ব্যস্ততা। কি করবে যেন স্থির করতে পারছেনা। আয়নার কাছে গিয়ে নিজেকে দেখল। চুলটা একটু মনের মত করল। আঁচলে মুখটা মুছে নিল। গুনগুন করে গাইল কিছু। তারপর কি করবে ভেবে না পেয়ে চিন্তিত হল। বাইরে জুতোর শব্দ ক্ষীণ আসছে কান পেতে শুনল। মাথায় যেন বুদ্ধি এল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করল। দরজার কাছে কান পেতে থাকল। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। তীব্র দ্রুত দরজায় পিঠ চেপে ঘুরে দাঁড়াল মঞ্জু।]

মঞ্জু। আমি খুলব না ত! তুমি কি বলতো! এত রাত্তিরে কেউ আসে?

[জোরে টোকার শব্দ হল]

বাইরের দরজাটা খুলে রাখব এ ত আমি মজা করে তোমাকে বলতে পারি। তাই বলে এভাবে এতরাত্তিরে আসতে হবে? এবার লুকিয়ে চুরিয়ে আমার দরকারটা কি তোমার?

[শব্দ জোরে হল]

দরজাটা ভেঙে ফেলবে নাকি? খুলব না। কি করবে তুমি! সেই থেকে ঠকঠক করে যেন হাতুড়ি পিটে যাচ্ছে! মুখে কথা নেই বুঝি! বোবা হয়ে গেছ? সারাদিন তো কথার জ্বালায় মুখে লাগাম বেঁধে রাখতে ইচ্ছে করে। শোন, বেশ মজা লাগবে আমি এখান থেকে আর তুমি দরজার ওপাশ থেকে যেমন খুশী কথা বলে যাও।

[শব্দ আরো জোরে হল]

কি আরম্ভ করেছ? বাবা উঠে পড়লে বুঝবে মজা। কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হোলনা তোমার। দাঁড়াও খুলছি। যেন পিছে আড়াইশ ভূত তাড়া করেছে।

[দরজা খুলল। দরজার কাছে একজন পাতলা লম্বা

চেহারার ছেলে এসে দাঁড়াল। একটু ক্লান্ত দেখতে, যেন অনেক দূর হেঁটে এসেছে। মঞ্জু ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে এবং ভয়ে যেন স্তব্ধ। তারপর ওকে শুদ্ধ দরজা বন্ধ করে প্রায় ঠেলে যেন ঘরের বাইরে করে দিতে চাইল। ছেলেটি অল্প চেষ্টায় ঘরে ঢুকে পড়ল। চারদিকটা দেখতে লাগল। মঞ্জু ঘরে এসে দূরে দাঁড়াল। ওর নিঃশ্বাস জোরে পড়ছে। চোখে ক্ষুব্ধ এবং অসহায় ভাব।]

মঞ্জু। কে আপনি ?

ছেলেটি। অন্তত কমল নয়। আমার নাম সমর, প্রদীপ, রজত, শৈলেন যা কিছু হতে পারে। তবে 'অশোক' বলে ডাকতে পারেন। কারণ এ-নামটা আপনার ছোটবেলা থেকে ভালো লাগে, লাগে না ?

মঞ্জু। আপনি একটা অপরিচিত বাড়িতে কাউকে না বলে ঢুকে পড়লেন যে ?

অশোক। অপরিচিত এই পৃথিবীটাতেও আমরা সকলে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়িনি ? বসি, কি বলেন ? এত হেঁটেছি। বসি ?

মঞ্জু। না, আপনি চলে যান। আশ্চর্য সাহস তো আপনার !

অশোক। ভয়ানক ভীতু আমি। বোকা, অপদার্থ। নাহলে আমি যে আপনাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি, ত্রিশটা বছর জানাতে সাহস করে কি একবারও আসতে পারতাম না ?

মঞ্জু। যা-তা বলছেন আপনি ! কোন মানে হয় না !

অশোক। হয়। মিথ্যে আমি বলি না। আমি কিন্তু বসে পড়লাম। (বসে) এত সুন্দর আপনার ঘর। আর এত চমৎকার আপনার চিবুক। আপনার গলার কাছের তিলটায় এখনো আমার দারুণ লোভ। আমি যদি মরে

গিয়ে ঐ তিলটা হতে পারতাম আপনি কিছুতে সরিয়ে দিতে পারতেন না আমাকে। আমি আপনার গায়ের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে চিরকালটা মিশে থাকতে পারতাম।

মঞ্জু। অত্যন্ত রুচিহীন আপনার কথাবার্তা।

অশোক। আমি যে আপনাকে ভালবাসি, সে কথাটা বিশ্বাস করলে বিন্দুমাত্র রুচিহীন মনে হবে না আমাকে। আপনার মনে হবে আমি একটা ভয়ানক আবেগে বলবান লোক। মেয়েরা তো এই আবেগেই ভালবাসে।

মঞ্জু। আপনার তত্ত্বকথা শোনার একবিন্দু স্পৃহা নেই আমার। আপনি চলে যান! নাহলে আমি বাবাকে ডাকব। পুলিশে দেওয়া উচিত আপনাকে।

অশোক। আমার কি দোষ? আপনি নিজেই তো বাইরের দরজাটা খুলে রেখে এলেন? আপনি চাননি কেউ আসুক। কোন ভয়, বিপদ? আপনি আমাকে চাননি?—যে আপনাকে একটা বিপজ্জনক ভয় ধরানো পথে হাঁটতে হাঁটতে তুমুল ভালবেসে যাবে। আপনি কি জানেন না, কমল আপনার কাছে ক্রমশ পুরনো, নিরাপদ আর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জু। না। কমলকে আমি ভালবাসি। বেশ ভালবাসি।

অশোক। ভালো তো আপনি জ্যোৎস্নাকেও বাসেন, ফুলকেও বাসেন, বাবাকেও বাসেন, ডালমুটকে বাসেন, ফুলকপির সিঙারাকে বাসেন, পেট্রোলের গন্ধকে বাসেন—কিন্তু ওরাও ত ক্লান্ত করে, ফুরোয়। একদৃষ্টে পৃথিবীর দিকে কে তাকিয়ে থাকতে পারে? ঘাড় ফেরাতে হয়। আর কমলের দিক থেকে ঘাড় ফেরালেই আমি। তাকান আমার দিকে। আমার হাতে ভয়ানক লাল লোভের মধ্যে আপনার মুখটা ধরতে দিন। দেখবেন, আমাকে আপনি চেনেন। আপনার রক্ত চেনে। আপনার

বুকের ভিতরের বেহিসেবি আবেগের নিঃশ্বাস চেনে। আপনার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরার গোপন ইচ্ছেগুলো চেনে। তাকান আমার দিকে। তাকান। আপনি চেনেন আমাকে। চিনতে চেষ্টা করুন। স্বীকার করুন।

মঞ্জু। না, চিনি না, চিনি না। আপনাকে আমি চিনতে চাই না।

অশোক। [হেসে উঠল। কোনের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়ল।] 'চিনতে চাইনা'—তাই বলুন। এত অসহায় লাগছে আপনাকে। ভাল লাগছে। আমিও কম অসহায় নই। সারা জীবন ধরে কারুর উদ্ভাসিত কপাল থেকে একটা চুল সরিয়ে দিতে পারলামনা। একটা ইস্পাতের সিন্দুক ভেঙে ফেলা যায় কিন্তু পাঁচটা নরম মেয়েলি আঙ্গুলের শক্তমুঠি খোলার শক্তি হয় না অনেকবার। হাজার কামানের শব্দেও উঠোনের রোদ একবিন্দু কাঁপে না। ভাবলে কি রকম অসহায় হতে হয় বলুন।

মঞ্জু। আপনার পায়ে পড়ি আপনি চলে যান! হয়ত কমল এসে পড়বে। ও আমাকে ভুল বুঝবে। বলা যায় না ও এক্ষুনি এসে পড়তে পারে।

অশোক। ওর জন্যই আমি বসে আছি।

মঞ্জু। তার মানে ওকে চেনেন আপনি ?

অশোক। বিলক্ষণ। বহুদিনের চেনা !

মঞ্জু। আপনি কি ওর বন্ধু ?

অশোক। কি দুঃখে বন্ধু হতে যাব। তবে দেখা হলে ওর সঙ্গে আমি একটা গোলমাল বাঁধাতে চাই।

মঞ্জু। বুঝতে পেরেছি। বিশ্রী রকম কি একটা উদ্দেশ্য রয়েছে আপনার।

অশোক। উদ্দেশ্য একটা আছে।

মঞ্জু। কিন্তু কি দোষ করেছি আপনার কাছে আমি ?

অশোক। আপনি আমাকে ভালবাসেননি কেন ?

মঞ্জু। আপনাকে চিনিনা আমি কোনকালে। দেখিনি পর্যন্ত।

অশোক। বললুম তো, চেনেন আমাকে, জানেন—মেনে নিতে পারছেন না। আমার অপরাধ কি জানেন ? বড্ড অসময়ে এসে গেছি। ঠিক সময়টাতে এসে পড়তে পারলে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চাই। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—দরজার বাইরে আমার বাক্সটা রেখে এসেছি, নিয়ে আসুন না। হালকা আছে।

মঞ্জু আপনি কি পেয়েছেন আমাকে ? যেন জুলুম করতে চাইছেন ?

অশোক। বাক্সের জিনিষ গুলোতে আপনারই লোভ বেশী। যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায় তাহলে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলব ইচ্ছে আছে।

মঞ্জু। আপনাকে শেষবারের মত বলছি আপনি চলে যান।

অশোক। বাক্সের জিনিষগুলোতে আপনার কৌতূহল নেই ?

মঞ্জু। না ! আপনি চলে যান !

অশোক। বাক্সে আপনার কিশোর বেলার শরীরটা মমি করে রাখা আছে। দেখবেন ? আনব ? আর আপনার তখনকার মন, যা একটা চড়ুই পাখির মত সারা ঘরে উড়ত।

মঞ্জু। আপনি একজন বদ্ধ উন্মাদ !

অশোক। ছোট বেলার সেই জামগাছটা মনে আছে ? একদিন বৃষ্টিতে প্রচুর জাম খেয়ে আপনার জিভটা কি দারুণ মজার নীল হয়েছিল মনে আছে ? ঐ মমিটার জিভও নীল। তখন ফ্রক পরতেন। ঐ মমিটার হাঁটুর কাছে একটা মিষ্টি কাটা দাগ আছে। বুড়ি বসন্ত খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে ভয়ানক কেটে গিয়েছিল, সেই দাগটা হয়ত এখনো আপনার সঙ্গে আছে।

মঞ্জু। আপনি চলে না গেলে আমি চেঁচাব।

অশোক। একদিন আপনি আপনার মায়ের বিয়ের বেনারসী পরেছিলেন। প্রচুর বৃষ্টি পড়ছিল। আপনি শাড়িটা কার জন্য পরেছিলেন ?

মঞ্জু। নিজের জন্য।

অশোক। মিথ্যে কথা। সেদিনের ফুলগুলো বাইরের বাক্সটার মধ্যে আছে। ওদের যদি ডেকে আনি ? বৃষ্টি, বয়স, চিৎকার এই সব কিছুতে উদভ্রান্ত ছেলেটি হঠাৎ ঐ বেনারসী শুদ্ধ আপনাকে যখন পাগলের মত ভালবেসে অস্থির করে তুলেছিল, তখন তাকে 'রাক্ষস' বলেছিলেন মনে আছে ?

মঞ্জু। (ভীতের মত) আপনি অভদ্র, যা তা বলছেন !

অশোক। সেদিন প্রথম পুরুষের আদর লেগে আপনার হাত, পা, ঘুম অন্য মানুষের মত হয়েছিল ; রক্ত আরো লাল। সেই রক্ত কণিকাগুলো আমি একটা শিশিতে করে ঐ বাক্সটায় স্পেসিমেন হিসেবে নিয়ে এসেছি। একদিন ছাদে মায়ের সঙ্গে বসে আমসত্ত্ব দিয়েছিলেন, রোদে মার মুখটা টুকটুকে হয়ে উঠেছিল। সেই লালচে রঙ আমসত্ত্বের গন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে তুলোয়, জড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আর আপনার প্রথম মেলে-ওঠা সেই মেয়েলি চোখ যা ক্যামেরায় ধরাও সম্ভব ছিলনা। তার নেগেটিভ রয়েছে। বাক্সটা নিয়ে আসব ?

[মঞ্জু টেবিলের কাছে চেয়ারটায় বসে মাথাটা নিচু করল]

বাক্সের জিনিষগুলো তাহলে পছন্দ হচ্ছে। আমি এবার 'তুমি' করে কথা বলব।

মঞ্জু। (চকিতে মাথা তুলে) না বলবেন না। (চোখ অসহায়) আমাকে 'তুমি' করে বলবেন না ! কি দরকার ? কি লাভ ?

অশোক। উপায় নেই, মঞ্জু। আমরা কেউ কাউকে ক্ষমা করবোনা।

আমি অনেক হারিয়েছি। আমার গায়ে জীবন্ত মানুষের টগবগে রক্ত নেই, আমার মানুষের মত সচল ছায়া পড়ে না। প্রেতের মত আমার পা উলটো, আমি সামনের দিকে চলতে পারি না, আমার হাতের রেখা মুছে গেছে। আমি একটা গোটা মানুষ হতে চাই। যদি এখন তোমার সেই কিশোর বেলার মেঘ ডেকে ওঠে, তারপর হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে—আমি তোমাকে নিয়ে ঐ বাক্সটা হাতে চলে যাব। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি এসেছি। তুমি না গেলে আমি নড়ব না।

মঞ্জু। আমি কোথাও যাব না। আপনার পায়ে পড়ি; আপনি যান। এক্ষুনি কমল আসবে হয়ত। আপনি কি চান, আমার সবকিছু ভেঙ্গেচুরে যাক?

অশোক। আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে। আমি আর কিছু বুঝিনা, জানিনা।

মঞ্জু। আমি যাব না।

অশোক। আমি উঠব না।

মঞ্জু। আমি চিৎকার করব।

অশোক। তুমি কত জোরে চেঁচাতে পার আমি শুনব। (জানলার কাছে গেল) জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমিও তোমার দ্বিগুণ চেচাঁব। আজকাল চেচাঁতেই আমার ভাল লাগে।

মঞ্জু। জানলার কাছে যাবেন না। যাবেন না বলছি!

অশোক। কেন?

মঞ্জু। একটা লোক এসে রাস্তায় রোজ দাঁড়ায়। আমার জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনাকে ও দেখতে পাবে। লোকটা হয়ত ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

অশোক। দেখলে ক্ষতি কি?

মঞ্জু। অনেক ক্ষতি, বুঝবেন না আপনি। অন্তত আপনি সরে এসে ভিতর দিকে বসুন। জানলাটি বন্ধ করে দিন।

অশোক। জানলাটা খোলাই থাক। বরঞ্চ চড়া আলোটা জ্বেলে রাখি। আমি নিজেকে সকলের কাছে এখন প্রকাশ করতে চাই। আমি নিজেকে দেখতে চাই। আমি তোমার সঙ্গে আছি, সকলে দেখুক। এর ওর কান হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে হৈ চৈ করে ছড়িয়ে পড়ুক।

মঞ্জু। কিন্তু ঐ লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। রোজ রোজ ও জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত এখনও জানালাটা খোলা দেখে তাকিয়ে আছে। একটু আড়াল থেকে দেখুন না, লোকটা আছে কিনা ?

অশোক। (বাইরে লুকিয়ে তাকিয়ে) হ্যাঁ, অন্ধকারে স্থির চোখে এদিকে তাকিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন এ-ঘরে আসি ও আমাকে দেখেছিল। পথের এক কোণে দু-পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

মঞ্জু। পাহারাওয়ালাদের মত পোশাক। জোৎস্নার রাত্তিরে একদিন ভাল করে তাকিয়ে দেখছি মুখটা কেমন অদ্ভুত চোখ দুটো বড় বেশী দেখে। ঠোঁট পুরু, ভয়ংকর নির্বিকার মুখ। এত ভয় করে আমার ! মনে হয়, আমার কোন গোপন সংবাদ ও জানে। একটা অদ্ভুত ভৌতিক ভয়ে আমি বাবাকে পর্যন্ত বলতে পারি না। কিন্তু ও লোকটা যদি রোজ রোজ এমনি এসে দাঁড়ায়, আমি মরে যাব !

অশোক। আমার সঙ্গে যদি তুমি চলে যাও, ও আর আসবে না। ওর হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে। (কিছু ভেবে) কিন্তু রেহাই নাও পেতে পার, তোমাকে লুকিয়ে লাভ নেই, ঐ পাহারাওয়ালার মত লোকটাকে হঠাৎ-হঠাৎ আমিও দেখতে পাই—গলির আকস্মিক মোড়ে, দোকানে ব্লেড কিনতে গিয়ে, মোটরের মারমুখী চাকার কাছ দিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে, অনেক রাত্তিরে একা ছাদে দাঁড়িয়ে ! লোকটা যেন আমাকে লক্ষ্য করছে,

অনুসরণ করছে, যেন ওর কি সব নোটবুকে টুকে নিচ্ছে। এত অস্বস্তি হয় !

মঞ্জু। কি চায় লোকটা ? আমি বুঝতে পারিনা, কিছুতেনা।

অশোক। হয়ত কিছুই চায়না। আমাদের পাহারা দেওয়াই ওর কাজ। মাথার উপরে বজ্রের থেকেও সাংঘাতিক একটা দৃষ্টি আমাদের সব কিছুর উপর ঘুরে বেড়ানো যে কি ভয়ংকর। জান মঞ্জু, আমি লক্ষ্য করেছি, কমলকেও বিরক্ত করে। কমলের বাড়ির জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। পিছে পিছে নিঃশব্দে হাঁটে। যখন একা পায়, ওর পিছু ছাড়ে না। কমল বলেনি তোমাকে ?

মঞ্জু। না তো !

অশোক। তার মানে, কমল তার সব কিছু তোমাকে জানায়না— তার অস্বস্তি, দুর্ভাবনা, বিরক্তি ! অথচ আমি তোমাকে আমার সম্পূর্ণ দিয়ে ছুঁতে চাইছি। (হঠাৎ বাইরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে) মঞ্জু. তোমার কমল অনেকদিন বাঁচবে। বোধহয় ও আসছে। যেন দৌড়ে আসছে।

মঞ্জু। (অশোকের হাত ধরে জানলার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে) জানলার কাছ থেকে সরে আসুন, হয়ত কমল দেখতে পেয়েছে। কি হবে এখন ! বললুম আপনি চলে যান !

অশোক। আমাকে জানলা থেকে সরিয়ে কি লাভ ? কমল তো ঘরে এসেই আমাকে দেখবে।

মঞ্জু। আমার একটা অনুরোধ রাখুন, আপনার পায়ে পড়ছি আপনি পাশের ঘরটায় যান ! যান না, একটা অনুরোধও রাখবেন না আপনি আমার !

অশোক। বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু কয়েক মিনিটের বেশী থাকলে কিন্তু হাঁপিয়ে উঠবো আমি।

মঞ্জু। কমলকে আমি চলে যেতে বলবো, যত তাড়াতাড়ি পারি।

আপনি যান। ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দেবেন, কেমন? যান, ওর শব্দ পাচ্ছি, যান।

[অশোক আস্তে পাশের ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। হঠাৎ টেবিলে সিগ্রেটের প্যাকেটটা পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত মঞ্জু তুলে নিল। বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে ব্যস্ত বিব্রত চাপা গলায় বলল]

শুনুন, আপনার সিগারেট প্যাকেটটা নিন, প্যাকেটটা নিন না তাড়াতাড়ি।

[দরজা বন্ধ। অন্যদিকে দরজা খুলে যাবার শব্দ হতেই মঞ্জু ফিরে তাকিয়ে কমলকে দেখল। মঞ্জুর হাতে সিগারেটের প্যাকেট। কমল প্যাণ্ট সার্ট পরা একজন সুদর্শন যুবক। মুখটা শান্ত।]

মঞ্জু। (হাসবার চেষ্টা করে) কমল তুমি আসবে আমি জানতাম, তবু কেমন ভয় হচ্ছিল যদি সব আমার পাগলামি ভেবে না আস।

কমল। তোমার পাগলামির খেলা দেখতে এলুম। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

মঞ্জু। (সন্ত্রস্ত) কিসের সন্দেহ?

কমল। বাইরের দরজা খুলে রেখে, ঘরের দরজার সব কটি খিল খুলে দিয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিপদ ঘরে ডেকে আনতে যে চায়, তার মাথার সুস্থতায় আমার সন্দেহ আছে।

মঞ্জু। কেন কাণ্ডটা মজার লাগছে না? প্রত্যেক দিনটা এত এক ঘেয়ে! একটা নতুন রকম কিছু ত ভেবে বের করলুম।

কমল। নতুন রকম? হ্যাঁ তা ত বটেই। যেমন তোমার হাতে সিগ্রেট। একেবারে অভিনব।

মঞ্জু। (ব্যস্ত ভাবে) ও এটা···তোমার জন্যে কিনলাম। কেমন অবাক লাগছে, না?

কমল। খুবই লাগছে, কারণ আমি যে সিগ্রেট খাই না, তা ত তুমি জান। বাজে পয়সা খরচ করে এটা কিনলে।

মঞ্জু। আজ থেকে খাবে তুমি, পুরুষ মানুষ সিগ্রেট না খেলে এত খারাপ লাগে। এক্ষুনি খাও, আমার কাছে বসে।

কমল। যাব? বলছ? (প্যাকেট খুলে) তুমি এমন কৃপণ, মাত্র তিনটে সিগ্রেট কিনেছ। অন্তত এক প্যাকেট তো কিনবে। শুভারম্ভ হবে তিনটে দিয়ে। এই স্পর্শে

মঞ্জু। শুরুতেই একটা প্যাকেট চাই? আমি যে কটা কিনে দেব, তার বেশী একটাও পাবেনা, বুঝলে!

কমল। তথাস্তু। কিন্তু দেশলাই?

মঞ্জু। দেশলাই তো নেই। ওটা তো কিনিনি। দাঁড়াও বাড়ির ভিতরে আছে কিনা দেখি।

কমল। যেতে হবে না। বস ত এখানে। (মঞ্জু, বেশ কাছাকাছি বসল) আসলে আমি সিগ্রেট খেতে আরম্ভ করি এটা ধূমপানের দেবতা চান না, তুমিও চাও না— ফলে দেশলাই নেই। ছেড়ে দাও। তুমি কাছে থাকলে, কোন বোকা সিগ্রেট খায়!

মঞ্জু। তবে কি খাবে? খুব সাহস না!

কমল। তেমন একটা সাহসী রাক্ষস আর হতে পারলাম কৈ? রাক্ষস হওয়াও ত একটা সাধনা। রীতিমত ব্যায়ামের দরকার।

মঞ্জু। আচ্ছা, কমল, একটা পাহারাওয়ালার মত লোককে আমাদের বাড়ির সামনেটায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে?

কমল। ছিল। কেন বলত?

মঞ্জু। ওকে তুমি আগে কখনো দেখেছ?

কমল। এখানে সেখানে দেখেছি।

মঞ্জু। মনে হত না। তোমাকে অনুসরণ করছে, তোমার পিছু নিয়েছে?

কমল। তুমি জানলে কি করে?

মঞ্জু। তুমি আমাকে যা লুকোও আমি জানতে পারি।

কমল। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে বলিনি। তোমাকে বললে ছেলে মানুষের মত ভয় পেতে, তোমার অশান্তি বাড়ত। অকারণ বাড়ত।

মঞ্জু। তুমি হয়ত এ রকম অনেক কিছুই বলনা।

কমল। বলি না। যা তোমার দরকার নয় তার অনেক কিছুই বলিনা।

মঞ্জু। কিন্তু আমি তোমার সব কিছু জানতে চাই। তোমার অফিসে কি সমস্যা হলো, রাস্তায় কোন মানুষটার মুখ তোমাব অদ্ভুত লাগল, কোন ইঁটটায় তোমার জুতো ভয়ানক ঠোক্কর খেল, কোন সময় আকাশটা তোমার ভালো লেগেছিল সব শুনতে চাই আমি, সব।—তোমার তোমার সব কিছু।

কমল। এত ছেলেমানুষ তুমি! পাহারাওয়ালার মত দেখতে লোকটা আমার পিছে পিছে থাকে তুমি জানলে কেমন করে?

মঞ্জু। ও যখন আমার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন নিশ্চই তোমার উপরেও নজর আছে। এ ত সহজ হিসেব। আমরা দুজন কি আলাদা?

কমল। লোকটা এমন অস্বস্তিকর! এক এক সময় ইচ্ছে করে অন্ধকারে একা পথে ওকে ধরে গলাটা টিপে মেরে ফেলি। ওকে দেখলে মনে হয়, আমি খুনীও হতে পারি।

মঞ্জু। কি বলছ তুমি! তোমার চোখ দুটো কী ভীষণ লাল দেখাচ্ছে।

কমল। ঠিক বলছি, লোকটা আমাকে অসহ্য করে তুলেছে!

নির্বিকারে একটা মুখ, দুটো প্রখর চোখ। মুখে কথা বলতে শুনিনি, হাঁটাটা যেন অলৌকিক, অনুক্ষণ যেন পিছনে দূর দিয়ে হেঁটে হেঁটে লক্ষ্য করছে। যেন আমার সব কিছুর উপর পাহারাদারী চলছে। আমি কি স্বাধীন নই, মুক্ত নই ?

মঞ্জু। ঠিক আমারো এরকম অস্বস্তি হয়, কমল। লোকটার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দরকার। আমিও ওর চোখ দুটোকে সহ্য করতে পারি না !

[হঠাৎ দরজা খুলে অশোক বেরুলো। মঞ্জু আতঙ্কগ্রস্ত। কমল অনেকটা বিমূঢ়, অশোক খুব শান্তভাবে ওদের টেবিলের কাছে এল। সিগ্রেটের প্যাকেটটা তুলে নিল।]

অশোক। (কমলের দিকে তাকিয়ে) এটা অসহায়। (মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে) ভিতরে যাচ্ছি। সময়টা বড্ড বেশী নিচ্ছে।

[চলে যেতে থাকে অশোক]

কমল। আপনাকে চিনতে পারলাম না।

মঞ্জু। উনি আমাদের একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বেড়াতে এসেছেন।

কমল। ও নমস্কার !

অশোক। নমস্কার। আপনি কমলবাবু, আমি চিনি। মানে চিনে নিয়েছি।

কমল। মঞ্জু বলেছে, নিশ্চই।

অশোক। না আপনাদের পথে ঘাটে দেখেছি। দুঃস্বপ্নেও দেখেছি ! মঞ্জুকে আজ নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

কমল। ও, কোথাও বেড়াতে নিশ্চয়। কোথায় থাকেন আপনি ?

অশোক। মঞ্জু, কোথায় থাকি আমি ?

মঞ্জু। আপনি কোন কথা বলবেন না আমার সঙ্গে ! কমল, তুমি যদি আমাকে বিন্দুমাত্র ভালবাস, ওর কথা বিশ্বাস কর না ! যা খুশী তাই বলছে। বাইরের দরজাটা

খোলা ছিল, হঠাৎ ঢুকে পড়েই সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে।

কমল। আমি আসার পরেই ওর কথা ত বলনি। দেখা হোতে বললে আত্মীয়, উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছো···কি হোয়েছে তোমার ?

অশোক। কথা ছিল, আপনাকে ও তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দেবে। দেরী দেখে সিগ্রেটের অভাবে আমাকে বাইরে আসতেই হল। উপায় ছিল না। তাছাড়া আমার সিগ্রেটের প্যাকেটটা নিয়ে মঞ্জুর প্রেম-প্রেম খেলাটা আমার এত কুৎসিত লাগছিল।

মঞ্জু। কমল, আমার আর কোন উপায় ছিল না তখন। আমি কি কবব বুঝে উঠতে পারিনি। বিশ্বাস কর কমল, আমি তোমাকে সব বলতাম। হঠাৎ বললে তুমি যদি কিছু বুঝতে না চেয়েই চটে ওঠ, তাই অনিচ্ছায় মিথ্যুক হতে হয়েছে। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না, আমি জানি। তুমি ওরকম গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ কেন ?

কমল। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা মঞ্জু। ভদ্রলোক যদি না বেরিয়ে পড়তেন, হয়ত ওঁর কথা আমাকে বলতেই না। এওতো হতে পারে। তুমিও কি আমাকে সব বলো ? —না মঞ্জু। আমি কিছু বুঝি না।

অশোক। আমাকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে আপনাদের। কিন্তু পৃথিবীর মিথ্যেগুলো আমার যেন না দেখালে নয়। আমি কি করব ? কোন দোষ করিনি, অথচ সব এধার ওধার চলে গেল। আমি দূরের কারুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি ফোনের তার কে কেটে দিয়ে পালিয়েছে। টেলিগ্রাফের পোস্ট তার সমেত একটি কোকিলের ভারে কোথায় ভেঙে ছিঁড়ে গেছে। চারিদিকটা এত ছত্রাখান ! এত ভাঙা ! আমারও ইচ্ছে করে সব ভাঙতে, ছড়াতে। সব

কৃত্রিমতা মিথ্যে হৈ চৈ করে চোখের সামনে তুলে ধরতে। এ এক রকমের নেশা। বিপজ্জনক নেশা।

মঞ্জু। আপনার এলোমেলো কথা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আপনি এখন অন্তত যান। আমাকে একটু শান্তি দিন।

অশোক। পরে আসার সময় পাব কিনা কে জানে! এই ত কত বছর পর সময় হল। তাছাড়া মরেও ত যেতে পারি। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি চল।

কমল। কি বলছেন আপনি। আপনার দাবিটা একটু জুলুমের মত শোনাচ্ছে না!

অশোক। জুলুম ছাড়া কিছু মেলে না। আমি অনেক ভিক্ষা করেছি, গ্লানি কাকে বলে জানি। মঞ্জু যদি আমার সঙ্গে না যায় ওর অনেক কিছু আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। যেমন ওর গাল, চিবুক, শরীর, আমার গায়ে মুখে, ঠোঁটে লেগে দশ বছর আগে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল তার সবটুকু আগুন ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অনেকগুলো পুরনো দিন, অদ্ভুত সব রঙিন কাঁচের বেলুনের মত বুকের মধ্যে সুতোয় ঝুলছে, সেগুলি ওর খুলে নিতে হবে। শরীরের কোথায় একটা পেরেক ফুটে আছে ওকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমি শান্তিতে ফিরে যাব।

কমল। মঞ্জু, তুমি আমাকে অনেক কিছু বলনি।

মঞ্জু। বলার মত কিছু নয়, কিছু ছিল না। তাছাড়া তুমিও আমাকে অনেক কিছু বলনি। আমি বুঝতে পারি, কি সব লুকোও, তা না হলে পাহারাওয়ালা লোকটাকে তুমি ভয় পাবে কেন?

কমল। আমার শরীরটা খারাপ লাগছে। আমি চলে যাব। ভয়ানক খারাপ লাগছে।

মঞ্জু। আমাকে একা রেখে তুমি কোথায় যাবে কমল?

কমল। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেও তুমি একা ছিলে। (একটু থেমে) কিংবা ছিলেনা।

মঞ্জু। তুমি এসব কি বলছ?

কমল। আমি জানি না কি বলছি। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। চলি।

[ভেজান দরজাটায় দু একটা টোকা শোনা যেতে ওরা দুজনে চমকে তাকাল। অশোক শান্তভাবে একটা সিগ্রেট ধরাল।]

মঞ্জু। কে?

[উত্তরের বদলে আবার টোকার শব্দ।]

অশোক। আমার মনে হয় পাহারাওয়ালা লোকটা।

[ধোঁয়া ছেড়ে বসল।]

মঞ্জু। তার মানে?

কমল। যদি আসে ভালোই হয়, অনেক দিনের বিরক্তির শোধ নেওয়া যাবে। যেন আমার সব কিছু গোপনতার উপর টর্চলাইটের মত দুটো চোখ সজাগভাবে ফেলে রেখেছিল! কিন্তু কোন সাহসে এল লোকটা?

অশোক। আমি যখন ও ঘরে ছিলাম। হাত নেড়ে লোকটাকে ডেকেছিলাম। বোধহয় তা-ই এল।

মঞ্জু। আপনি তো নানাভাবে জ্বালাচ্ছেন! আবার একটা নতুন উপদ্রব এনে হাজির করলেন। আমার সমস্ত শরীরটা লোকটাকে দেখলে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

অশোক। ঐ পাহারাওয়ালাটা আমারও শত্রু। আমাকেও সারাজীবন চৌকি দিয়ে যেন গণ্ডীর মধ্যে নজর বন্দী করে রেখেছে। আমাকে স্বাধীন হতে দেয়নি। হাত পা ওর কাছে যেন বাঁধা রেখেছি! আমার প্রচণ্ড রাগ। তোমারও এ রকম রাগ আছে ওর উপর মঞ্জু, তুমি চাও না ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে? চাওনা?

মঞ্জু। চাই।

কমল। তাহলে ও আসুক। ও কি চায় আমাদের কাছে জানতে হবে আমাকে। ও যদি আমাকে না ছেড়ে দেয়, ওকেও আমিও ছাড়ব না। মঞ্জু দরজাটা খুলে দাও।

মঞ্জু। আমি পারব না।

অশোক। বেশ আমি খুলছি। দেখছি। আমিও সাহসী।

[দরজা খুলে দিতে আস্তে আস্তে নিতান্ত রহস্যময় দেখতে একটি লোক ঢুকল। খাঁকি জামাপ্যাণ্ট ও সার্টে অনেকটা পুলিশের মত দেখতে। মুখ নির্বিকার। দুটো চোখের দৃষ্টি প্রখর। ঠোঁট পুরু। হাঁটা মন্থর, ভারি এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন। লোকটিকে পরিচিত পৃথিবীর স্পষ্ট কেউ বলে মনে হবে না। সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসল। নিঃশব্দে।]

অশোক। বসুন।

[লোকটি বুঝল না। দাঁড়িয়ে থাকল।]

কমল। (আঙুল দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে) বসুন চেয়ারে।

[এবার আস্তে গিয়ে বসল।]

কমল। আপনি কি চান? কেন ছায়ার মতো আমার পিছনে চলে বেড়ান!

[লোকটি চুপ।]

অশোক। আমার কাছে কি দরকার আপনার?

মঞ্জু। আপনি আমার জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন কেন?

[লোকটি চুপ।]

কমল। কথা বলুন!

অশোক। (ঝাঁকি দিয়ে) কথা বলছেন না কেন?

মঞ্জু। হয়ত কথা বলতে পারে না। বোবা।

[অশোক লোকটার পেটে একটা খোঁচা দিল। মুখ দিয়ে একটা গোঙানির শব্দ বেরুল। মুখে কাতরতা ফুটল। তারপর আবার নির্বিকার মুখ।]

অশোক। লোকটা কানেও শুনতে পায় না। এখন কি করা যায় ওকে নিয়ে! ছেড়ে দিলে আবার গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াবে।

মঞ্জু। অসহ্য! একটা কাগজে ও কি চায় লিখে দেখাও তো। যদি পড়তে পারে, যদি লিখে দেয়।

[কমল পকেট থেকে পেন বের করে টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে লিখে ওর চোখের সামনে ধরতে হাত বাড়িয়ে নিল। মুখে সেই হাসি। সকলের দিকে রহস্যময় তাকাল। তারপর কলমটা নিয়ে নিচু হয়ে লিখতে লাগল। সকলে উৎসাহে কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ক্রমশ মুখে উৎসাহহীন বিস্ময়। কাগজটাকে প্রায় ছিনিয়ে নিল কমল।]

কমল। কি লিখেছে মাথা মুণ্ডু। এগুলো কোন অক্ষরই নয়। কতগুলো এলোমেলো দাগ। ভয়ংকর চালাকি রয়েছে লোকটির মধ্যে। একটা ঘোরেল লোক!

অশোক। যে কোন উপায়েই হোক লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ও আমাদের শত্রু। ওকে আমরা শাস্তি দিতে চাই। ও যদি কোনরকম কষ্টকর অত্যাচার এখান থেকে পেয়ে যায়, তাহলে চোখের কাছ থেকে ঠিক সরে পড়বে। অন্ততঃ শাস্তির ভয় দেখানো যেতে পারে।

কমল। একটা কাজ করা যাক। এর গলায় একটা দড়ি জড়িয়ে আমরা দুদিক থেকে আস্তে আস্তে টান দিতে থাকি।

অশোক। দড়ি কোথায়? ভাগ্যিস লোকটা কানে শোনে না!

কমল। লোকটা আমাদের তিনজনের শত্রু। কাজেই এর উপর যখন অত্যাচার করা হবে আমাদের তিনজনকেই কিছু না কিছু ভাগ নিতে হবে। মঞ্জু, তুমিও বাদ যাবে না। মঞ্জু ওর আঁচলটা আস্তে ওর গলায় পাক দিয়ে জড়াবে, যেন কৌতুক। তারপর দুদিক থেকে ধরে আমরা টান দেব।

মঞ্জু। এসব বিশ্রী ব্যাপারে আমি থাকব না। তোমরা যা খুশী কর।

কমল। অর্থাৎ অপরাধটা আমাদের দিয়ে করাতে চাও! চলবেও না। তোমাকেও যোগ দিতে হবে।

মঞ্জু। কিন্তু আমি পারব না। ভাবতেই পারছিনা। যদি মরে যায়?

কমল। মরবে কেন? তার আগেই আমরা ছেড়ে দেব।

মঞ্জু। কিন্তু ভয় করছে আমার।

অশোক। ভয় তাড়িয়ে তুমি লোকটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। ওর মাথায় চুলে আস্তে আস্তে হাত রাখ। দেখ, কি রি-অ্যাকসন হয়। তারপর যেন তোমার একটা মজার খেলা, এভাবে ওর গলায় আঁচলটা ঘুরিয়ে দাও। লোকটা বাধা দেবার আগেই আমরা দুদিক থেকে টেনে ধরব।

মঞ্জু। কি রকম নিষ্ঠুর লাগছে! এত বিশ্রী ব্যাপার এসব!

কমল। আমার অবাক লাগছে। ওর সামনে যে আলোচনা হচ্ছে তার বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারছেনা! লোকটা দেখছি আমাদের থেকেও অসহায়।

অশোক। কই যাও! আমরা ওর পিছনের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

[ওরা পিছনে চলে গেল। মঞ্জু লোকটির সামনে এসে বসল, তাকাল। লোকটি তেমনি নিঃশব্দে রহস্যময় হাসল। তারপর খুব সন্তর্পণে নিজের হাতটা তুলে ওর একটা গাল ছুঁল। মঞ্জু ওর হাতটা ধরল। এমনি ভাবে আস্তে আস্তে পিছনে গেল। মাথায় হাত রাখল। লোকটা মাথাটা ঘোরাতে যেতেই, মঞ্জু সামনের দিক করে দিল। আঁচলটা ওর গলার উপর দিয়ে নিয়ে এল। একটা পাক দিল। ওরা দুজন দুদিক থেকে এসে ধরল। মঞ্জুর দিকে কমল, অপর প্রান্তে অশোক। ওরা টান দিল। ক্রমশ জোরে টানতে লাগল। লোকটার চোখ বড় হল, একটা শব্দ বেরুল, কষ্টের।]

মঞ্জু। ছেড়ে দাও! এবার ছেড়ে দাও।

[ওরা আর একটু জোরে টানল।]

মঞ্জু। কি করছ! ছেড়ে দাও! মরে যাবে যে!

[ওদের মধ্যে যেন মেরে ফেলবার একটা নেশা জেগে উঠল। লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেল। চোখ লাল। মুখের সমস্ত শিরা ফুলে উঠল। দুহাতে কাপড়টা দুদিকে ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। মঞ্জুকে অস্থির দেখাচ্ছে। ও কমলের হাত ধরে টানতে আরম্ভ করল।]

মঞ্জু। ছেড়ে দাও বলছি! ছেড়ে দাও। কি হচ্ছে! ছেড়ে দাও। মরে যাবে, ঠিক মরে যাবে!

[ওরা আরো জোরে টান দিল। যেন কিছুই কানে যাচ্ছে না। একসময় লোকটির কাঁধ ঢলে পড়ল, চোখ বন্ধ। চেয়ারের পিঠে ওর মাথা হেলে রইল। ওরা ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিল। মঞ্জু স্থির দাঁড়িয়ে রইল, ওর চোখে মর্মান্তিক ভয়।]

মঞ্জু। কি হল!

কমল। যা হবার, মারা গেছে।

মঞ্জু। তার মানে তোমরা মেরে ফেলতে চাইছিলে? খুনি, তোমরা খুনি! তোমাদের দিকে তাকাতে ঘৃণা করছে আমার। তোমরা কি!

অশোক। খালি আমরা নয় তুমিও—মুক্তির জন্যে মানুষ যা করে তা পাপ নয়।

কমল। এখন যা খুশী করা যাবে। পথে যখন হাঁটছি বা কোথাও যাচ্ছি মনে হবে না নজরবন্দী হয়ে আছি। তোমার ভাল লাগছে না—জানলা দিয়ে আর কেউ সুযোগ পেলেই তোমার দিকে তাকাতে পারে না। তোমার ওপর নজরবন্দী করার আর কেউ নেই ভেবে তোমার আনন্দ হোচ্ছে না।

মঞ্জু। কি আশ্চর্য, এ সময় তোমাদের আনন্দ হচ্ছে। একটা

মড়া চোখের সামনে। এত বিশ্রী লাগছে আমার। এত ভয় করছে।

অশোক। মড়াটা তো আছেই। মুক্তির আনন্দটা ত কিছুকাল করে নাও। তাছাড়া এই মরা শরীরটা তোমার গেস্ট। তোমার বাড়ির অতিথি, ভাবনাও তোমার। আমি কি করতে পারি।

মঞ্জু। আমার অতিথি মানে? তোমরা মেরে ফেলেছ। আমি মারতে চাইনি।

কমল। কিন্তু তোমার আঁচলের ফাঁসে মারা গেছে, মানো ত?

মঞ্জু। তার জন্যে আমি দায়ী হব কেন? আমি তোমাদের অত জোরে টানর্তে বারবার নিষেধ করেছি।

অশোক। কিন্তু মনে মনে চাইছিলে, আপদ মরে গেলেই ভাল।

মঞ্জু। আমার মনের খবর আপনি নিশ্চই আমার থেকে বেশী জানেন না।

অশোক। অনেক সময় জানি। লোকটা মরে গেছে দেখে যতটা ভয় পাবার কথা তুমি ত তা পাওনি। তাছাড়া এরকম মারাত্মক খেলায় কত সহজে তুমি যোগ দিয়েছিলে।

মঞ্জু। আপনার কোন কথা শুনতে চাই না আমি কমল, কিছু একটা কর। একটা মড়া ঘরে রেখে আমি যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা।

কমল। বিশ্বাস কর মঞ্জু, এরকম সিচুয়েশনে আমি পড়িনি কখনো। ব্যাপারটা কিভাবে ট্যাকল করা যায় আমি বুঝে উঠতে পারছি না। সব কিছু সমস্যার পিছনে (অশোককে দেখিয়ে) এই ভদ্রলোক। উনি এসেই গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছেন। আমরা দু'জন মাত্র থাকলে এসব ঝামেলাই হোত না। ঐ লোকটাকে কে ডাকলো—উনিইতো। আমরা কোন দিনতো ডাকিনি।

মঞ্জু। (অশোককে) আপনিই আসলে দায়ী। আপনাকেই ভাবতে হবে কি করা যায়। সব দায়িত্ব আপনার।

অশোক। দায়িত্ব থাকতে পারে। কিন্তু আমি ত ওটাকে তোমাদের প্রেজেণ্ট করেছি। তোমরা দুজনে ওটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখবে, মধ্যে মধ্যে পচে ওঠা দুর্গন্ধে সকলের আড়ালে দমবন্ধ করে থাকবে, কখনো কেউ দেখে ফেলার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে। বেশ লাগছে আমার। নিষ্ঠুরতা এত ভাল নেশা।

মঞ্জু। মড়াটার কোন বন্দোবস্ত আপনাকেই করতে হবে। ছাড়ব না আপনাকে।

অশোক। আমাকে শাসিয়ে কি লাভ? তোমার অন্য কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হল না, মড়া ফেলতে ডোম হতে যাব কেন? যেরকম হঠাৎ এসেছিলাম, এক্ষুণি তেমনি চলে যাচ্ছি—

[উঠল অশোক]

হ্যাঁ, (মঞ্জুকে) বাইরে একটা বাক্সে তোমার কিশোর বয়সের মণিটা রয়েছে, ওটা অবশ্য আমি নিয়ে যাচ্ছি। চলি। নমস্কার।

কমল। থামুন, যেতে পারবেন না আপনি। আমাদের বিপদে রেখে নিজে দায়মুক্ত বলে যাবেন? মানে? আপনাকে থাকতে হবে, অন্ততঃ একসঙ্গে সব বিপদ ভাগ করে নিতে হবে।

অশোক। রাজি আছি। তবে একটা শর্তে। বিপদ কেটে গেলে মঞ্জুকেও আমাদের দুজনের মধ্যে সমান ভাগ করে নিতে বাধা দেবেন না, বলুন?

কমল। কোন মানে হয় না আপনার কথার!

অশোক। মানে হয় না বলেই, আমি চলে যাব।

মঞ্জু। আপনাকে থাকতে হবে, তিনজনে মিলে কোন উপায় বের করতে হবে। আপনি থাকুন। (অসহায়ভাবে) আপনি থাকুন না!

কমল। আপনাকে এত সহজে আমি যেতে দেব না।

অশোক। আমি থাকলে, অলসের মত বসে থাকব, নানারকম দাবি করব, মঞ্জু রাজী হবে না, আপনিও না। আপনারা আমি চলে যেতে বাধা দিলে আপনাদেরই অসুবিধে, আমি চেঁচাব। গোলমালে পৃথিবীর লোক জেগে উঠবে।

[অশোক দরজার কাছে গেল]

মঞ্জু। সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন? আমার ভয় করছে কিন্তু, শুনছেন, আমার ভয় করছে কিন্তু, শুনছেন, আমার ভয় করছে, আপনি থাকুন না।

কমল। আমরা দুজনে মড়াটা নিয়ে কি অসহায়, বুঝছেন না।

অশোক। বুঝেও কোন লাভ নেই আমার। আমার চলে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। পৃথিবীতে প্রথম শ্মশানের মধ্যে আমি একটা ফোন রাখার ঘর তৈরী করছি। যেখান থেকে মৃত্যুর পরেও ফোন করা যায়। কি ভিড় হবে আমার ফোন ঘরে। আচ্ছা, নমস্কার। চলি। আসা আর যাওয়াটা যদি মসৃন রাখতে পারতাম। বোধ হয় মসৃণভাবেই যাচ্ছি।

[অশোক চলে গেল]

কমল। লোকটি নিজে ত বেমালুম তোমায় কথায় ভুলিয়ে কেটে পড়ল। আসলে তুমিই সব কিছুর জন্যে দায়ী। যদি এরকম একটা কিম্ভুত খেলা শুরু না করতে কোন গণ্ডগোলই হত না, আমরা যেমন ছিলাম তেমনি থাকতাম।

মঞ্জু। কিন্তু কোন অপরাধ ত আমি করতে চাইনি। আমি তোমাদের কাউকে কখনো বিপদে ফেলতে চাইনি। যখন যা হয়ে গেছে, আমার অনিচ্ছায় হয়েছে, বিশ্বাস কর।

কমল। বিশ্বাস অবিশ্বাসে আর যাই হক মড়াটা সরানোর কোন উপায় হবে না। এ মড়াটার সব দায়িত্ব তোমার, তোমারই ভেবে পথ বের করা উচিত। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মঞ্জু কিন্তু আমি একা কি করব ? কি পারি আমি ?

কমল। আমিই বা পারব ভাবছ কি করে ?

মঞ্জু। কিন্তু তুমি ছাড়া এখন কে করবে ?

কমল। আশ্চর্য, সকলের তৈরী একটা বিপদ আমাকে কাঁধে করে টানবার ভার চাপাচ্ছ ! অদ্ভুত অনুরোধ ত তোমার।

মঞ্জু। সকলের বলছ কেন ? এখন সমস্যাটা কেবল তোমার আর আমার। দুজনে মিলে আমাদের বাঁচতে হবে।

কমল। আমি মড়া বয়ে নিচে নামতে পারব না ! অসম্ভব ! সোজা কথা।

মঞ্জু। কি হবে তাহলে ? ভোর হয়ে যাবে, লোকজন আসবে।

কমল। কি হবে আমি জানি না। তোমাদের এতবড় বাড়ি আছে, কোথাও লুকিয়ে রাখ। কোন একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখ।

মঞ্জু। এসব এভাবে লুকিয়ে রাখা যায় না ! তুমি বুঝতে পারছ না।……কিছু একটা কর।

কমল। কি করব আমি। নিজের গলায় দড়ি দিয়ে নিজেকে বাঁচানো ছাড়া কোন পথ দেখছি না।

মঞ্জু। (গম্ভীর ভাবে) তুমি আমার কথা ভাবছ না। নিজের ভয়ে উত্তেজিত হচ্ছ। নিজের অসহায়তার কথা ভাবছ, আমাকে ভাবছ না। এরকম একটা সংকটে পড়ে ভালই হল কমল, আমাদের দুজনের মধ্যের ফাঁকটার দূরত্ব কতখানি, আমার মেপে নেবার হয়ত দরকার ছিল।

কমল। তুমিও ত আমাকে সহানুভূতি দিয়ে ভাবছ না ! যা

আমার সাধ্যের বাইরে, তাই করতে বলছ আমাকে। যা সম্ভব নয় আমার পক্ষে তা আমি কেমন করে করি।

মঞ্জু। যখন সম্ভব নয় তুমি যেতে পার। যা করবার আমিই করব।

কমল। এ তোমার রাগের কথা।

মঞ্জু। রাগের কথাও নয়, অনুরাগের কথাও নয়। যাবে বলেছিলে, বরঞ্চ বিপদ না বাড়িয়ে চলে যাও।

কমল। মঞ্জু, আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারলুম না।

মঞ্জু। আমার বোঝার শেষ।

কমল। তুমি আমাকে বুঝতে চাইছো না।

মঞ্জু। আমার অনেক দোষ আমি জানি।

[ভিতর থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল]

টমিটা ডাকছে, বোধহয় বাবা জেগে উঠেছে। দাঁড়িয়ে কি ভাবছ ? নিশ্চই আমাব উদ্ধারের কথা নয় ?

কমল। ভাবছি, তোমাকে অসহায়ের মতো ফেলে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমাকেও কম অসহায়ের মতো যেতে হচ্ছে না।

[টমিটা আবার ডেকে ওঠে]

মঞ্জু। বাবা এসে পড়বে। তুমি যাও।

কমল। হয়ত অপরাধীর মতোই যাচ্ছি।

[কমল চলে যায়। মঞ্জুও একা স্থির বসে থাকে। মুখে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।]

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর ! মঞ্জু, এবার তুমি একা। আয়নাটার কাছে যাও। তোমার সেই ছায়াটা, দেখো—এখনো হাসছে—ওর খেলাটায় ও কিন্তু এক বিন্দুও ভয় পাচ্ছে না। মঞ্জু, তুমি পাহারাওয়ালাটার দিকে তাকাও। ও এক্ষুনি জেগে উঠবে। পাহারাওয়ালাটাকে মেরে ফেলা ভীষণ শক্ত। ঐ দ্যাখো, ও উঠছে (পাহারাওয়ালা ধীরে ধীরে ওঠে, দরজার দিকে হেঁটে যেতে থাকে) ওর অনেক কাজ।

ছুটো প্রখর চোখ মেলে ওকে চিরকাল তাকিয়ে থাকতে হবে—ওকে মেরে ফেলা ভীষণ শক্ত। (পাহারাওয়ালা বাইরে চলে যায়।) মঞ্জু, আয়নাটার কাছে যাও, তোমার ছায়াটাকে আয়নার ভিতর থেকে নিজের মধ্যে তুলে নাও। (মঞ্জু, আয়নার কাছে যায়, তাকায়।) অনেক রাত হোল। বাইরের দরজা দিয়ে যারা যারা এসেছিল, সকলেই আজকের মত ফিরে চলে গেল। তুমি দর্শকের মত অনেক কিছুই দেখলে, তাই না? দেখাই-টাতো জীবন, বেঁচে থাকার সাহস। অনেক রাত হোল। আয়নায় তোমার ছায়াটার খেলা আজকের মত ফুরালো —ওকে বুকের মধ্যে তুলে নাও।

[মঞ্জু আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে প্রসন্ন মুখে হাত বাড়িয়ে দেয়। পর্দা নেমে আসে।]

লাঠি

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা উঠলে মঞ্চে নিম্নবিত্ত পরিবারের একটা ঘর। সংসারের গৃহিনী অন্নদা ঢোকে, হাতে চায়ের কাপ।]

অন্নদা। কই গো তোমার হোল ? চা হয়ে গেছে।

নীলু। মা চিরুনীটা কোথায় গেল ?

অন্নদা। রতন মাথা আঁচড়ে কোথায় রেখেছে ছাখ।

নীলু। একটা জিনিস যদি ঠিকমতো রাখে। এটা ওখানে ওটা সেখানে।

অন্নদা। (বিছানার নীচে চিরুনীটা পড়ে আছে দেখে) এই তো পড়ে আছে।

নীলু। (হাত বাড়িয়ে নেয়) দেখলে তো ! (অন্নদা খাটে বসে বিমর্ষ, ক্লান্ত) রতনটার বড্ড চুল উঠছে। (অন্নদা কিছু ভাবছে। নীলু চুল আঁচড়ায়) বাবা কি বাথরুমে ?

অন্নদা। হ্যাঁ, তৈরি হচ্ছে। দেখছিস না জামা জুতো সব রেডি। কাল থেকে আবার এক লাঠি জুটিয়েছে। রোজ রোজ সন্ধেবেলা কোথায় যে যায় ! এদিকে অফিস কামাই করে সারা দুপুর দরজা জানলায় খিল দিয়ে পড়ে থাকছে।

নীলু। আজ নিয়ে পাঁচদিন হোল। বাবার একটা কিছু হয়েছে মা। সবসময় কি ভাবছ—এ'কদিনে চোখ মুখ কেমন বসে গেছে দেখেছ ?

অন্নদা। যে মানুষটা জ্বর তাপ নিয়ে অফিসে ছোটে, সে মানুষটা কেমন বদলে গেছে। একটা কিছু তো হয়েছেই। কিন্তু ঘরের মানুষকে তো সেটা বলবে। কোনো কথার উত্তর নেই, থুম মেরে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। যত জিগ্যেস কর, এক উত্তর শরীর ভালো না। ভালো না তো ডাক্তারের কাছে যাও। সেও তো যাবে না। চিরটা কাল অভাব দুর্যোগ মাথায় করে চলেছে—কিন্তু একটা

দিনও মুখ গোমড়া করে থাকেনি। অথচ পাঁচটা দিলও না, এর মধ্যে মানুষটা কেমন যেন বদলে গেল।

নীলু। আমি তোমাকে বলছি দেখো, নিশ্চই বাবার অফিসে কিছু একটা হয়েছে।

অন্নদা। কি হবে অফিসে? তোর বাবা তবিল ভেঙেছে? সে সব মানুষের ধাতই আলাদা।

নীলু। অফিসে কতরকম ঝামেলা হয়।

অন্নদা। কি জানি, ওসব কিছু হলে বলতো না? জিজ্ঞেস করলে তো চুপ করে থাকে। কেমন অস্বাভাবিক ভাবসাব, আমার ভালো ঠেকে না বাপু। থাক গে অদৃষ্টে যা আছে তা হবে। এ জন্মে তো তাকে পাপ করতে দেখিনি—ভগবান যদি গতজন্মের শাস্তি দেন তো ভোগ করতে হবে।

[নীলু মাথা নীচু করে। হরিপ্রসাদ মুখ হাত মুছতে মুছতে ঢোকেন—জামা পরেন।]

নীলু। বাবা কোথায় বেরোচ্ছ?

হরি। এই কাছেই যাব।

অন্নদা। অফিস থেকে ক'দিনের ছুটি নিয়েছ?

হরি। না, ঠিক ছুটি নয়। তবে শরীরটায় কদিন ধরে জুত পাচ্ছি না। দেখে বোঝো না?

অন্নদা। তোমায় দেখে না বুঝলেও, তোমার লাঠিটা দেখে বুঝতে পারছি।

হরি। লাঠি? একদম জোর পাইনা। থেকে থেকেই খালি মনে হয় আমার সব কিছুই যেন ফুরিয়ে আসছে।

অন্নদা। অলুক্ষুণে কথা বোলো না তো। মানুষের জীবনে বিপদ আসে দুর্যোগ আসে—চিন্তা ভাবনায় মানুষ মাথা তুলতে পারে না।—সংসারে এসব হয়। কিন্তু তোমার মতো কেউ নিজের মাথা একা পেতে দিয়ে বসে থাকে না। ঘরের পাঁচজনকে আপন ভাবে তাদের বলে। [চোখ মোছে]

হরি। এসব তুমি কি বলছ? 'দেখ, আবার চোখের জল ফেলে। নীলু, ছাখ তো তোর মার আবার কি হোল।

নীলু। মা ঠিকই বলেছে বাবা। তুমি আমাদের কাছেও লুকোচ্ছ। তোমার কিছু একটা হয়েছে আমাদের বলতে চাইছ না।

[দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। হরি চমকে ওঠেন। ভয় পান।]

হরি। নীলু, দেখতো মা—কে এলো?

[নীলু চলে যায়]

অন্নদা। তুমি ওরকম চম্‌কে উঠলে কেন?

হরি। কই না তো! [নীলু ঢোকে] কে রে?

নীলু। তোমাদের মালিক মিঃ ঘোষের কাছ থেকে আসছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হরি। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? যা যা গিয়ে বল আমি অসুস্থ, শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি।

অন্নদা। কি জন্যে এসেছে শুনবে তো।

হরি। সে আমার জানা আছে।

[নেপথ্যে—"হরিবাবু। ভেতরে আসতে পারি?"]

হরি। [আতঙ্কিত] দাঁড়িয়ে আছিস যে? গিয়ে বল যে অসুখ, শুয়ে আছি! যা—

অন্নদা। একবার শোনোই না কি বলে।

হরি। চুপ করো! যা বোঝ না, তা নিয়ে চেঁচামেচি কোরো না। কী রে যা— [নীলু চলে যায়]

অন্নদা। ব্যাপারটা ভালো করলে?

হরি। চুপ, কথা বললে আমার গলা শুনতে পাবে। [নীলু ঢোকে] কিরে, গেছে?

নীলু। হ্যাঁ।

হরি। আর কিছু বলল?

নীলু। না।

হরি। তুই কিছু জিগ্যেস করলি ?

নীলু। কী ?

হরি। কেন এসেছে—কি বৃত্তান্ত ?

নীলু। আমি আবার কি বলবো? জানি নাকি কিছু যে জিগ্যেস করবো।

হরি। আচ্ছা, ঐ যে লোকটা এসেছিল ওর হাতে কি কোনো পিওন বুকটুক দেখলি ?

অন্নদা। কি আবোল তাবোল বকছো ? নিশ্চয়ই তুমি অফিসে কোনো কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ। এখন চোরের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছ ?

হরি। পালিয়ে বেড়াব কেন, পালিয়ে বেড়াবো কেন ? যাঃ ব্যাটাচ্ছেলে এসে দেরী করিয়ে দিল।

অন্নদা। তার মানে তুমি ঘোষের বাড়ি যাচ্ছো না ? কেন লোক পাঠিয়েছে তা জানার দরকার নেই ?

হরি। না, না। আমার অন্য কাজ আছে। জানার ইচ্ছে থাকলে তো এখুনি জেনে নিতাম !

অন্নদা। যা ইচ্ছে করো, আমি আর পারি না।

[হরি লাঠি নিয়ে বেরিয়ে যান]

নীলু। মা, ওমা, বড়মামাকে একটা খবর দেবো ?

অন্নদা। আবার বড়মামাকে কেন ?

নীলু। বাবা যেরকম করছেন তাতে বড়মামাকে একটা খবর দেওয়া দরকার।

অন্নদা। কোনো দরকার নেই। ঘরের লোক যেখানে হদিশ করতে পারছে না, সেখানে বাইরে থেকে এসে সে আর কি করবে ? কপাল পুড়লে কি কেউ এসে জল ঢেলে জ্বালা জুড়োতে পারে, ভাগ্যে যা আছে হবে !

নীলু। বাবা দিনকে দিন এরকম হয়ে যাবেন, আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো ?

অন্নদা। নাতো কি, গলা ফাটিয়ে দশ দুয়োরে গিয়ে চ্যাঁচালেই সব ঠিক হয়ে যাবে? গা পোড়ানো কথা যত! রতনকে বলেছি, ওর অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিতে। এসে কি বলে ছ্যাখ।

নীলু। রতন বাবার অফিসে গেছে?

অন্নদা। বলেছি তো যেতে—ঐ তো। [রতন ঢোকে, গম্ভীর] কি রে গিয়েছিলি?

রতন। না—জগোবন্ধু কাকুর বাড়ী গিয়েছিলাম।

অন্নদা। জগোবন্ধুকাকু!

নীলু। বাবার অফিসের জগোকাকু, ভুলে গেলে?

রতন। [উষ্ণ] তোমার এই একটা রোগ—এক এক সময় তুনিয়ার কাউকে চিনতে পার না। বোঝাতে এক মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট লেগে যায়।

অন্নদা। তাতে কি হয়েছে? অত মাথা গরম করছিস কেন? সবকিছুর একটা সময় আছে। এত বড় একটা বিপদ ঘাড়ের ওপর। পারিসও তোরা। ভেবে কুল পাচ্ছিনা, চিন্তায় চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছি। গেলি একটা দরকারি খবর আনতে কি হ'ল বলবি। তা না—যে যার মেজাজ নিয়ে আছে! থাক তোরা তোদের মেজাজ নিয়ে; সে মানুষটা মরুক বাঁচুক তোদের কি তাতে?

রতন। [নরম গলায়] মাথা গরম কি আর এমনি হয়? বাবাকে অনেকবার বলেছি যেখানে সেখানে যা মনে হয় কমেণ্ট কোরো না। হুট্‌পাট কিছু বোলো না। বয়স হয়েছে বলে তো আর সব জায়গায় রেহাই পাওয়া যায় না।

নীলু। তুই কি আরম্ভ করেছিস। তোর ভনিতার তো শেষ নেই। জগোকাকু কি বললেন সেইটা আগে বলবি তো!

রতন। সে কথাই তো বলছি।

নীলু। তা অত থেমে থেমেই বা বলছিস কেন?

অন্নদা। তুই থামতো! [রতনকে] অন্য কথার দরকার নেই, জগো কি বললো সেটা বল।

রতন। বললেন বাবা অফিসে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছেন।

অন্নদা। সে কিরে? বলছিস কি?

রতন। বাবার অফিসের নতুন মালিক মিঃ ঘোষ, তার কীর্তিকলাপ তো বাবার মুখেই শুনেছ। ছাঁটাই, যা-তা কথা, হুকুম, ধমক, সে একেবারে নাকি বাপের জায়গায় বসে বাপের দশ গুণ হয়েছে। মুখ বুজে না থাকলে নয় তাই—অফিস শুদ্ধু লোক ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। লাস্ট যেদিন বাবা অফিসে গেলেন—অফিসের পর সেদিন বাবা আর জগো-কাকু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন—মালিককে নিয়ে কিসের কথা হচ্ছিল, হঠাৎ বাবা বলেছেন—"ঘোষের বাপটা ছিল চামার আর তার সন্তানটি হয়েছে জানোয়ার।" বাবা অতটা খেয়াল করেননি, কথাটা বলার সময় মিঃ ঘোষ একেবারে বাবার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অন্নদা। কি সর্বনাশা কাণ্ড!

নীলু। বাবার কি দোষ? বাবা তো আর জানতেন না যে পেছনে ঐ বদলোকটা এসে হাজির হবে।

অন্নদা। সে কথা আর এখন বলে কি হবে! কপাল যা পুড়বার তা তো পুড়েছে সময় খারাপ পড়লে মানুষের এমন দশাই হয়।

রতন। এজন্যই তখন বলেছিলাম, বাবার একটু খেয়াল কম। পাঁচজন আজকাল যে রকম সাবধান হয়ে এসব কথা বলে বাবা তো সেটা করবেন না।

নীলু। অসহ্য হয়ে না হয় একটা কথা বলেছেন। তাও নিজেদের মধ্যে—আমাদের ভাগ্য খারাপ তাই এমন হলো। বাবাকে আর দুষে কি হবে?

অন্নদা। কত মানুষ তো কত সময় এরকম বলে—এমন তো হয়

না। সব কপালে করে। এখন বুঝি, কেন মানুষটা এমন হয়ে আছে! মাথার ওপর পাহাড় ভেঙে পড়লে কেউ কি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে?

নীলু। একটু আগে তো মালিক লোক পাঠিয়েছিল।

অন্নদা। কেন পাঠিয়েছে, তা শুনতে দোষের কি ছিল! লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যে গেল?

রতন। বাবাকে তো দেখলাম ঘটকদের কালীমন্দিরের চাতালে বসে আরতি দেখছেন।

অন্নদা। রোজ রোজ তাহলে এই সময়টা মন্দিরে গিয়ে বসে থাকে।

[হন্তদন্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হরিপ্রসাদ ঢোকে]

হরি। (হাতে খাম) রতন, রতন, নীলু!—

সবাই। কি হলো? বাবা ওরকম করছো কেন? কী হয়েছে?

হরি। সর্বনাশ হয়ে গেল রে। তোদের সর্বনাশ হয়ে গেল!

অন্নদা। বসো, বসো এইখানটায়। কি হয়েছে বলবে তো?

[সবাই হরিকে বিছানায় বসায়]

হরি। মন্দিরে বসে আরতি দেখছিলাম। মালিকের লোকটা ওঁৎ পেতে কোথাও বসেছিল. হঠাৎ এসে "এই যে হরিবাবু আপনার চিঠি" বলে এই চিঠিখানা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অন্নদা। চিঠিতে লিখেছ কি?

হরি। খুলে দেখিনি। খুলে দেখার সাহস নেই আমার।

রতন। দেখি দেখি। [চিঠি খুলে মনে মনে পড়ে]

অন্নদা! কি? লিখেছে কি?

হরি। কি আবার? বরখাস্তের নোটিশ।

রতন। বরখাস্তের নোটিশ তো নয়। মালিক তোমাকে এক্ষুনি দেখা করতে লিখেছে।

অন্নদা। বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছে। আর তুমি বরখাস্তের চিঠি ভেবে কি কাণ্ডই না করছো। পারোও।

হরি। বাড়িতে ডেকে পাঠালেই কি সব ফাঁড়া কেটে যায়?

বাড়িতে ডেকে বরখাস্তের নোটিশ হাতে ধরিয়ে দিতে পারে না ? তোমরা তো জানো না কত কি ঘটে গেছে—

নীলু। আমরা সব জানি। রতন তোমাদের জগোবন্ধু কাকুর বাড়ি গিয়েছিল।

হরি। ও, জগো তাহলে সবই বলেছে ?

অন্নদা। ঘরের কথা পরের বাড়িতে গিয়ে জানতে হয়—আমাদের বল্লে কি ক্ষতিটা তোমার হতো ?

নীলু। তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি। একটা খারাপ লোককে খারাপ বলেছ—

হরি। ভাবলাম কোনোমতে মিটিয়ে নেব। মাঝখান থেকে তোরা আর কেন মিছিমিছি দুর্ভাবনা করবি। সারা জীবনই তো নানা কষ্ট পেয়েছিস আর কত ? তোর একটা কোনো গতি হলো না। রতনটা দাঁড়াতে পারল না। আরেকটা বছর হালখানা ধরে রাখতে পারলে এই যুদ্ধ করে চলার একটা যেমন তেমন পরিণাম হয়তো হোতো। [ওপর দিকে হাত তুলে] কিন্তু তিনি ওখান থেকে বললেন "না হে হরিপ্রসাদ—তরী তোমার তীরে এসে ভিড়বে না !"

নীলু। এসব ভাবো কেন ? তুমি কি আমাদের জন্য কিছু কম করেছ !

রতন। তুমি এত নার্ভাস হয়ে পড়।

অন্নদা। মিটমাটের চেষ্টা কিছু করেছ ?

হরি। জগো ওরা বলছে মালিকের বাড়ি গিয়ে দেখা করতে যে রকম মানুষ আমার ঠিক সাহস হয় না। বাড়ি পর্যন্ত বার দুই গেছি—কিন্তু গেটটা পেরুতে গিয়েই কেমন থতোমতো খেয়ে যাই—

অন্নদা। তুমি একবার গেলে পারতে।

রতন। আমার মনে হয় তোমার যাওয়াটা দরকার। বরখাস্তের

চিঠির ভয় করছো—রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠালে তুমি কি করবে? মালিক বরখাস্ত করতে চাইলে চিঠি পাঠানো আটকায়?

হরি। তাহলেও যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ তো আমার চাকরীটা আছে।

অন্নদা। আমি বলি কি, তুমি একবার যাও। এরকম মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে টেঁকা যায় না। যা হবার হয়ে যাক্!

হরি। গেলে আরো কি হতে পারে জানো? আমাকে দিয়ে জোর করে রেজিগনেশনের কাগজে সই করাতে পারে। নিজের হাতে আমাকে নিজের পদত্যাগপত্র লিখতে হতে পারে বুঝেছ? ঐ লোক সব পারে। বদলোকের অসাধ্য কি আছে? এতো আর পাঁচটা বড় সড় অফিস কারখানার মতো না যে ইউনিয়ন এসে মালিকের টুঁটি টিপে ধরবে। এখানে মালিকই হচ্ছে হর্তা কর্তা বিধাতা।

রতন বরখাস্ত হবে এটা তুমি একেবারে ধরেই নিয়েছ। অন্যরকমও তো কিছু হতে পারে! তুমি অফিসের সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী। কোনোদিন তাদের কোন রকম অসুবিধে করোনি, এটাও তো ওরা জানে। তোমার ব্যাপারে একটু নরমও হতে পারে।

অন্নদা। রতন ঠিকই বলেছে, তুমি বড্ড একবগ্গা ভাবছো।

হরি। এই মালিকের বাপ বেঁচে থাকতে ওরকম হলেও হতে পারতো। কিন্তু ওর বাপকেও যে আমি গাল পেড়েছি। গ্রহের ফের না হলে কেউ এমন সর্বদিকে জড়িয়ে পড়ে।

রতন। জগোকাকু বলছিলেন, তোমাদের অফিসের রসময় বাবু না কি নাম—উনি মালিককে তোমার হয়ে বলবেন।

হরি। রসময়? রসময় মালিকের খুবই পছন্দের লোক। রসময় আমাকে ভালোও বাসে। ও অবশ্য আমাকে বলছিল, মালিককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ম্যানেজ করবে। (ভাবতে

ভাবতে) তাহলে কি রসময়ের সঙ্গে কথা হয়েছে? যাওয়াটা উচিত ছিল তাহলে?

রতন। হয়তো রসময়বাবুর কথায় মালিক নরম হয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অন্নদা। তুমি যাও।

নীলু। হ্যাঁ বাবা।

রতন। এতরকম ভাবার থেকে যাওয়াই ভালো।

হরি। (অন্নদাকে) ঠিকই বলেছ, মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলিয়ে এভাবে থাকা যায় না। যা হবার হয়ে যাক।

অন্নদা। হ্যাঁ ঠাকুরের নাম করে যাও। সব শুভই হবে। [দুহাত কপালে ঠেকায়)

হরি। মালিকের ঘরে ঢোকার সময় আমার মনের অবস্থাটা কি হবে ভাবো। যদি খারাপ কিছু হয়? ঐ খবরটা নিয়ে আমি কি করে তোদের সামনে এসে দাঁড়াবো?

নীলু। আবার তুমি ঐ সব ভাবছো?

[হরিপ্রসাদ ভীত, অবসন্ন]

হরি। তোরা যখন বলছিস, যাই—তবে সারাটা পথ কি মাথায় নিয়ে যে যাব। ভয় ভাবনা যে কতবড় শত্তুর। অবশ— সব অবশ করে দেয়।

অন্নদা। রতন যাক না তোমার সঙ্গে।

রতন। যাব বাবা?

হরি। না দরকার হবে না। দে আমার লাঠিটা দে।

অন্নদা। লাঠি দিয়ে কি হবে? যেই মনটা দুর্বল হয়েছে ওমনি লাঠি আর ঠাকুর দেবতা। এতকাল ছিল তোমার লাঠি?

নীলু। কাল লাঠি কিনলে। সেদিন আবার কে মাদুলি দেবে বলছিলে।

হরি। মনের জোর পড়ে যাচ্ছে। মাদুলিটা দরকার ছিল যে আমার। লাঠিটা আজ অন্তত রাখি সঙ্গে দে।

অন্নদা। নীলু, লাঠিটা দিবিনা। এমন করে চললে অসুখ. বাধিয়ে বসবে। দিবিনা লাঠি।

[লাঠি নীলুর হাতে। ঐ দিকে হাত বাড়ায় এক অসহায় লোক]

হরি। দে ওটা—আজকের দিনটা শুধু। অবশ লাগে, মাথাটা ঘোরে। দে লাঠিটা। পায়ের নীচের মাটি আমার টলমল করে। দে, দেনা।

[লাঠির দিকে হাত বাড়িয়ে হরিপ্রসাদ। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মালিক মিঃ ঘোষের সুসজ্জিত বসবার ঘর। বন্ধু সুখেন এবং মিঃ ঘোষ মদ্যপান করতে করতে কথাবার্তা বলছে]

সুখেন। ঘোষ !

ঘোষ। উঁ।

সুখেন। তোমার বাচ্চাটাকে কোথায় দিচ্ছ ?

ঘোষ। ভাবছি।

সুখেন। এখনও ভাবছ ? আরে নামী দামী রেসিডেন্‌শিয়াল স্কুল হস্টেলে সিট পাওয়া আজকাল কত বড় প্রবলেম সেটা তোমার জানা নেই। স্রেফ আউট হয়ে যাবে। সারাটা বছর ছেলেকে মায়ের কোলে বসিয়ে রাখতে হবে বুঝেছ ?

ঘোষ। সে সব খেয়াল আছে। হবে হবে সব হবে। টাকার নাম ভগবান, তিনি সহায় থাকলে বিনা মেঘে বৃষ্টি হয়। মেঘলা আকাশে চাঁদ ওঠে—সিট্ না থাকলেও অ্যাডমিশন হয়।

[দরজার কাছে লাঠিতে ভর দিয়ে হরিপ্রসাদ এসে দাঁড়ায়]

সুখেন। একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

ঘোষ। কে ?

হরি। আমি স্যার। (লাঠি শুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করে)

ঘোষ। আমিটা কে ?

সুখেন। চশমাটা পরে নাও। (ঘোষ চশমা পরে এবার দেখতে পায়)

ঘোষ। আচ্ছা, আসুন ভেতরে আসুন। (হরি ভেতরে আসে) বসুন।

হরি। (সঙ্কুচিত ভাবে) ঠিক আছে।

ঘোষ। ঠিক নেই। বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন (হরিপ্রসাদ বসে) সুখেন দত্ত, আমার বন্ধু। (সুখেনকে) ওঁকেই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম—হরিপ্রসাদবাবু।

[সুখেন নমস্কার করে হরিপ্রসাদ প্রতি নমস্কার করে।]

ঘোষ। আবার দাঁড়িয়ে আছেন। (হরি বিনীত হেসে বসে) সনাতন বলল, আপনি নাকি অসুস্থ—মন্দির-টন্দির ছাড়া নাকি কোথাও যাচ্ছেন না। তা অসুখটা কি?

হরি। আজ্ঞে এই—বড় দুর্বল লাগে। একটু হাঁটাচলা করলেই বুকটা কেমন—

ঘোষ। লাঠি ধরেছেন?

হরি। আজ্ঞে, জোর পাইনা। গতকালই মাত্র কিনেছি! বাড়িতে সবাই বকাবকি করছে।

সুখেন। নাও। (একটা গ্লাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দেয় ঘোষের দিকে।]

ঘোষ। আপনি আসছেন না শুনে এসব সাজিয়ে বসেছি। আবার মোদো মাতাল বলে গালাগালি দেবেন না তো?

হরি। কি যে বলেন।

ঘোষ। (চুমুক দিয়ে) আমার বাবাকে চামার বলেন, আমাকে জানোয়ার বলেন, আর এখন মদ খাচ্ছি, মোদো মাতাল বলবেন না? (হরি মাথা নাড়ে) বলবেন, একশোবার বলবেন।

হরি। হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলে বড় অন্যায় করে ফেলেছি স্যার। দয়া করে যদি মাফ করে দেন!

সুখেন। দয়া করে? (হরিপ্রসাদের দিকে তুড়ি বাজিয়ে) এই যে মিস্টার—মিস্টার···

ঘোষ। হরিবাবু।

সুখেন। মিঃ হরিবাবু—আপনি কোনো দিন তীর্থে-টির্থে গেছেন?

ঘোষ। সেখানে নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন যে, একজন ভিখিরির বাচ্চাকে যদি দয়া করে ডুটো পয়সা দেন তাহলে অসংখ্য ভিখিরিরা আপনাকে ছাঁকাবাঁকা করে ঘিরে ধরবে। অর্থাৎ আপনি যদি তীর্থ করতে যান এবং দয়া দেখাতে চান তাহলে আপনাকে ফতুর হয়ে ফিরে আসতে হবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

হরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঘোষ। তার মানে হোল, যদি আমাকে বিজনেস্ করতে হয় এবং সবাই অন্যায় করলে মাপ করতে হয় তাহলে তো হোল লাইফ সবাইকে মাফ করেই যেতে হবে। তবে তো দুদিনেই আমার বিজনেস্ ডকে উঠবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

হরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুখেন। সেই জন্যেই ডিসিশন হচ্ছে—নো মার্সি।

ঘোষ। নো মার্সি। দয়ার কোন ব্যাপার নেই।

হরি। আমি মরে যাব স্যার।

ঘোষ। আপনার কটি ইস্যু?

হরি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

ঘোষ। তবে ওরা মরে যাবে, ভেসে যাবে, উচ্ছন্নে যাবে—সেটা বলুন। নিজে মরে যাব—এরকম সেলফিস কথা বাপ হয়ে কি করে ভাবছেন? "আমি মরে যাব স্যার!"—নিজের উপর এত মায়া? ছিঃ ছিঃ!

হরি। এখনও আমি ওদের ভরসা—তাই ওভাবে বলছিলাম স্যার। দয়া করে মাফ করে দিন স্যার।

সুখেন। স্ত্রী বেঁচে আছেন?

হরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঘোষ। তার কথা ভাবেন?

হরি। ভাবি।

ঘোষ। কেবল এই আমার কথাটাই ভাবেন না, অ্যাঁ? এই বদ জানোয়ারটার হাতের সুতোয় পরিবারশুদ্ধ ঝুলে আছেন। সুতোটা ছিঁড়ে দিলে কোথায় পড়বেন?

হরি। এরকম কথা আমি আর কখনো উচ্চারণ করব না স্যার। এবারের মতো মাফ করে দিন স্যার।

ঘোষ। কি করব?

হরি। মাফ করে দিন স্যার।

[হো হো করে হেসে ওঠে সুখেন]

ঘোষ। কি হোলো?

সুখেন। ঐ হাজার বার করে মাফ করে দিন স্যার, আর করব না স্যার—কথাটা শুনে ছেলেবেলার ইস্কুলের কথা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে। বুঝলে ঘোষ, ইস্কুলে থাকতে রোজ একটা বাঁদরামী করতাম—আর হেড স্যার অফিসে নিয়ে গিয়ে বেত তুলতেন। আর ওমনি এরকম বলতাম "মাফ করে দিন স্যার, আর করবো না স্যার, মাফ করে দিন স্যার।"

[আবার হাসি]

ঘোষ। আর আমাদের হেড স্যার তখন কি করতেন জান? বেতটি মারতেন না। বলতেন "কান ধর, দাঁড়া বেঞ্চের উপর"—এবার কান ধরে বল "আর করব না।" (হরিকে) বুঝলেন তো এসব ছেলেবেলায় চলে।

হরি। চাকরীটা গেলে ভেসে যাব স্যার। এবারের মতো মাফ করে দিন স্যার।

সুখেন। আবার!

ঘোষ। আবার ওকথা বলছেন?

হরি। আর কি বলব স্যার! আপনি মাফ না করলে সবশুদ্ধ শেষ হয়ে যাব স্যার।

ঘোষ। আমি কি আপনার হেড স্যার?

হরি। আপনি আমার সব স্যার।

ঘোষ। আগে বলুন, আমি কি আপনার হেডস্যার? তবে মাফ করার কথা উঠবে। বলুন, আমি কি আপনার হেড স্যার?

হরি। হ্যাঁ স্যার।

ঘোষ। দেন স্ট্যাণ্ড আপ অন দ্য চেয়ার।

সুখেন। রাইট্।

ঘোষ। চেয়ারটার ওপর উঠে দাঁড়ান। উঠুন—উঠুন (হরিপ্রসাদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়) চেয়ারের ওপর, চেয়ারের ওপর।

সুখেন। স্ট্যাণ্ড আপ।

ঘোষ। (চেঁচিয়ে) আই সে স্ট্যাণ্ড আপ। (হরি চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ায়) কান ধরুন, ধরুন কান, ধরুন!

সুখেন। কান ধরো।

ঘোষ। ধরো কান।

[হরিপ্রসাদ কান ধরে। দু-বন্ধু চেঁচিয়ে ওঠে 'চিয়ার্স', চিয়ার্স। মার্সি। হরিপ্রসাদের দু চোখ বেয়ে জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

তৃতীয় দৃশ্য

[আলো জ্বলছে। হরিপ্রসাদের ঘর। অন্নদা বিছানা ঠিকঠাক করছে। খুশী দেখাচ্ছে। হরিপ্রসাদ চেয়ারে বসে বিড়ি ধরায়। কেমন বিষণ্ন। কি এক ভাবনায় আচ্ছন্ন। লাঠিটায় হাতের ভর রেখে চুপচাপ বসে আছে হরিপ্রসাদ।]

অন্নদা। এখন শুয়ে পড়। এ ক'টা দিন ঘুম বলতে তো কিছু ছিল না। নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাও। আবার বিড়ি ধরিও না। (হরি নিরুত্তর) এমন ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে এ কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি। তুমি মানুষটা কেমন সে তো জানে তোমার মালিক। তাই মুখের কথাটাকে তত আমল দেয়নি। আবার লাঠিটা আঁকড়ে ধরে বসে আছ? আচ্ছা, ঐ চাকরীর ভয়ে তো লাঠি ধরেছিলে, এখন তো সে ভয় কেটেছে। এবার ঐ লাঠিও তোমায়

ছাড়তে হবে। (হরি নিরুত্তর) তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করবো? (হরি মাথা নাড়ে) বিপদের বোঝা নেমে গেলে মানুষের মন মেজাজ একটু হাল্কা হয়। মালিকের ওখান থেকে ফেরার পর তুমি যেন কিরকম হয়ে আছ। তোমাকে কি কিছু খারাপ কথা বলেছে?

হরি। আমি তো আর ভালো কথা কিছু বলিনি। দই বা মিষ্টি কথা কি'করে বলে!

অন্নদা। ও মালিক লোক একটু আধটু ধমক-ধামক না দিলে তার সম্মানটাই বা থাকে কি করে? দুদিন একটু খচ্‌খচ্‌ করবে তারপর যে কে সেই হয়ে যাবে।

হরি। হলেই ভালো।

অন্নদা। তোমার এই মালিক কিন্তু লোক তেমন খারাপ না। তুমি যাচ্ছ না, লোক পাঠিয়ে ডেকে মিটমাট করে দিল। তোমার খারাপ চাইলে তো করতে পারতো।

হরি। আমার খারাপ ভালো তো কখনো ভাবিনি অন্নদা। নিজে চুনকালি মেখে সঙ সেজেও যদি ছেলেমেয়েদের মুখগুলো একটু ঝক্‌মকে রাখতে পারি তাহলেই আমার শান্তি! ওদের একটু শক্ত জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই ইহলোকে স্বর্গলাভে।

অন্নদা। তাছাড়া আর কি?

হরি। (হঠাৎ উত্তেজিত) শুধু এইটুকুর জন্যে যদি কেউ মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধায় চেপে শহরটা ঘুরে আসতে বলে তো করব না? আমি কি আমার মান নিয়ে বসে থাকব? বল? বল সেটা?

অন্নদা। ওকি? তুমি ওরকম করছো কেন?

হরি। আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও। [উত্তেজিত]

[অন্নদা উত্তেজনার কারণ বুঝতে না পেরে শান্ত করতে করতে বলে।]

অন্নদা। তুমি একটু ঘুমোও। আর কথা না। এ কদিন কি ঝড়টাই না বয়ে গেছে তোমার উপর দিয়ে। নাও শুয়ে পড়। শোও—। বালিশের তলায় পাখা আছে। টেবিলের উপর জল ঢাকা দেওয়া আছে। আমি যাচ্ছি।

[হরিপ্রসাদ অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। অন্নদা যেতে যেতে ফেরে।]

কি হোল? অস্বস্তি হচ্ছে তোমার? কি হয়েছে? (কাছে যায়) শরীর খারাপ লাগছে?

[হরিপ্রসাদ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়। অসুস্থ দেখায়।]

হরি। অন্নদা, তুমি আমার কাছটায় একটু বসো—একটা কথা আছে। (অন্নদা কাছে বসে।) অন্নদা, একবার আমি তোমাকে লুকিয়েছি—সে বড় কষ্ট। আর আমি লুকোবো না।

অন্নদা। কি লুকোবে না? কি হলো?

হরি। আমার বিষ খেতে ইচ্ছে করে অন্নদা।

অন্নদা। (চমকে ওঠে) চুপ। এ কি শোনাচ্ছ আমাকে?

[লালু, রতন ঢোকে। হরি নিজের গলা চেপে অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলে।]

হরি। আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

অন্নদা! (আর্তনাদ) তুমি কি সত্যি কিছু খেয়েছ নাকি?

হরি। আমি কিছু খাইনি, শুধু একটা কষ্ট। অন্নদা, মালিক আমাকে অপমান করেছে। আমাকে কান ধরে চেয়ারের ওপর দাঁড়াতে হুকুম করেছে!

[অন্নদার মুখটা কঠিন হতে থাকে

অন্নদা। তুমি তাই করলে?

হরি। না করলে যে চাকরী যায়!

অন্নদা। ছিঃ ছিঃ! [উঠে দাঁড়ায়।]

হরি। তুমি আমাকে ঘেন্না করছো?

অন্নদা। তুমি সত্যি সত্যি তাই করলে ?

হরি। না করে উপায় ?

অন্নদা। মান মর্যাদায় তোমার একটুও বাধলো না ?

হরি। মান রাখতে যে প্রাণ যায় অন্নদা ! ঘর-সংসার সব যে যায় !

অন্নদা। যাক, এইভাবে পয়সা এনে তুমি ছেলেমেয়ের মুখে দেবে। তোমার মান খোয়ানো পয়সায় পেটের অন্ন আমার বমি হয়ে যাবে না ? একটা ছেলে নেই আমার ? তোমার মর্য্যাদার জন্যে সে ঘাড়ে বোঝা নিতে পারবে না ? তোমার বউ মেয়ে গতর খেটে পয়সা আনতে পারবে না ? না পারে তো তারা তোমার মালিকের চেয়েও অমানুষ। তাদের জন্য তোমার কিছু করার নেই। চাকরী না, পয়সা না, কিছু পাওনা নেই তাদের।

হরি। অন্ন, তোমার এই মূর্তি আমার ঘরের মধ্যে ছিল। অথচ আমি দুচোখ মেলে তা দেখিনি।

অন্নদা। পয়সার ডুগডুগি বাজিয়ে ওরা মানুষ নিয়ে বাঁদর খেলাচ্ছে ? তোমার হাতে তো লাঠিটা ছিল। একটা ঘা মেরে তুমি শিক্ষা দিতে পারলে না ? তারপর যা হবার তা হেতো।

[হরিপ্রসাদের মুখে ভাবান্তর। উজ্জ্বল এবং উত্তেজিত।]

হরি। অন্ন, অন্নদা……তুমি কত সহজে আমাকে নির্ভয় করে দিলে। তাহলে বলি শোনো—শেষ কথাটা শোনো—তুমি যা বল্লে আমি তাই করেছি।

অন্নদা। করেছ ?

হরি। হ্যাঁ চেয়ারের ওপর উঠে কান ধরে দাঁড়িয়েছি—হঠাৎ মাথাটা কি রকম করে উঠলো। শরীর মনে মানুষের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে উঠলো। লাফিয়ে পড়লাম জানোয়ারের উপর। তারপর ঐ লাঠিটা দিয়ে মাতাল শয়তানটার

মাথায় জোরে কয়েকটা ঘা বসালুম। বাঁদরগুলো যে বাঘ হয়ে উঠতে পারে সে শিক্ষা আমি তাকে দিয়ে এসেছি।

নীলু/রতন। বাবা!

[উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে হাঁপাতে থাকে হরিপ্রসাদ। অন্নদা, নীলু, রতন হরিকে গিয়ে ধরে। মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

চতুর্থ দৃশ্য

[ঘোষের ড্রইং রুম। ঘোষ বসে আছে। সামনের টেবিলে প্রাতঃরাশ সাজানো।]

ঘোষ। কি খবর সকালবেলা?

হরি। (নম্র গলায়) আপনার কাছে এলাম।

ঘোষ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দরকারটা তো আপনার কালই মিটে গেছে। আবার কি চাই?

হরি। (শান্ত) দু'চারটে কথা ছিল।

ঘোষ। বসুন। [একটু কিছু খায়] বসুন।

হরি। একটু বেশী সকাল সকাল হয়তো এসে পড়েছি।

ঘোষ। আমার কাছে সকাল-সকাল নয়। আমি রোজ পাঁচটার আগেই উঠি। হ্যাঁ এসে ভালোই করেছেন। কালকে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। খুব একটা মাইণ্ড না করলেই খুশী হব।

হরি। না আমি কিছু মাইণ্ড করিনি।

ঘোষ। থ্যাঙ্ক ইউ। একটু মালটাল খেয়েছিলাম, মেজাজটা অন্য-রকম ছিল, আসলে ব্যাপারটা আমরা খেলাচ্ছলে নিয়েছি। আর এই গেমটাও বুঝলেন কিনা, হঠাৎই এসে গেছে।

হরি। না, আমার তখন ঐ কান ধরে দাঁড়িয়ে থেকে একটা কথা মনে পড়ে হাসি পাচ্ছিল।

ঘোষ। কিন্তু আপনি তো কেঁদে ফেলেছিলেন।

হরি। না, না, আমি ভাবছিলুম কান ধরাটা এমন আর কি?

ঘোষ। কি বলছেন আপনি! আপনি কান ধরে দাঁড়িয়েছেন অথচ ইনসাল্টেড ফিল করেন নি? অপমান বোধ করেন নি?

হরি। না করিনি।

ঘোষ। অ্যাম আই টু বিলিভ ইট? আপনি বাজে কথা বলছেন। স্মার্ট হবার চেষ্টা করছেন।

হরি। একদম না।

ঘোষ। কোনরকম অপমান বোধ হচ্ছিল না? একদম না?

হরি। না।

ঘোষ। কেন বলুন তো?

হরি। ব্যাপারটা সয়ে গেছে তো, সেই জন্যে।

ঘোষ। সয়ে গেছে? কি রকম?

হরি। ধরুন গিয়ে আমরা হচ্ছি হুকুমের চাকর। দু কানে হাত দিয়েই কাজকর্ম করা। হুকুমে উঠি, হুকুমে বসি। এই চলে আসছে।

ঘোষ। (ভাবান্তর) বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলছেন! কি বলতে চান আপনি?

হরি। বাইরে দেখলাম ফুটফুটে একটি ছেলে খেলা করছে। ওটি আপনার ছেলে?

ঘোষ। (চিন্তিত) হ্যাঁ।

হরি। আপনার স্ত্রী আছেন?

ঘোষ। (বিরক্ত) কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

হরি। ভাবছি আপনার এত ধনদৌলত।—হঠাৎ যদি আপনার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায় তাহলে আপনার বউ ছেলের কি হবে?

ঘোষ। থামুন! এরপর আপনাকে বাইরে যেতে বলব। আপনি একবার আজেবাজে কথা বলেছেন, এবার স্রেফ চ্যাংড়ামি শুরু করেছেন। ব্যাপারটা আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে।

হরি। আর কোনো খারাপে আমার ভয় নেই।

ঘোষ। ভয় নেই ?

হরি। না, আর ভয় নেই। একটা জিনিস আমি বুঝে ফেলেছি —যেই আপনি আমাকে বাঁদর বানাবেন ওমনি আমি বাঘ হয়ে যাব। তাতে মরি আর বাঁচি। আর এটাই হচ্ছে বাঁদর নাচানোর উচিত শিক্ষা। আপনাকে একটু শিক্ষা দেবো।

ঘোষ। আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন! বি কেয়ারফুল!

হরি। ভয় দেখাবেন তাতে আর আমার ভয় নেই। এই যে লাঠিটা—এটা দিয়ে আমি আপনাকে একটা ঘা দেব—দেবই।

[শক্ত হাতে লাঠিটা ধরে হরিপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায়—ঘোষ আতঙ্কিত।]

ঘোষ। সনাতন।

হরি। উঁহু, দ্বিতীয়বার আর কাউকে ডাকবেন না। তাহলে তার সামনেই মারবো। অপমানটাতো তাতে আরো ছড়িয়ে পড়বে। এখানে না পারি, অফিসে ; নয়তো পথে ঘাটে—আমি মারবোই। শিক্ষাটা আমায় দিতেই হবে।

ঘোষ। লাঠি নামান বলছি। বিপদ ডেকে আনছেন!

হরি। বলছি তো যার ভয় নেই— তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। লাঠি আমি উঁচিয়ে আছি। অভুক্ত প্রাণীকে আমি আঘাত করব না।— সে মানুষই হোক আর জানোয়ারই হোক। খাওয়া শেষ হলেই আমি মারবো।

[লাঠি ঘোষের মাথার ওপর। ঘোষের মুখে আতঙ্ক। তীব্র, হরির কণ্ঠে আদেশ।]

হরি। খান খান। (ঘোষ একটা টোস্ট মুখে দেয়।) খান। (ঘোষ চিবোয়) তাড়াতাড়ি! খা! খা!! খা!!!

[হরিপ্রসাদের উদ্যত লাঠির নীচে আতঙ্কিত ঘোষ খাবার খায়।]

পর্দা পড়ে

ভূত

[ঘটনাস্থল একটি সেকেলে চেহারার ঘর। বহুকাল অব্যবহারের চিহ্ন ঘরটির সর্বত্র। দেখলে মনে হবে, কোন পোড়ো বাড়ির ভেতরটা যেমন হতে পারে তেমনি। বাড়ি বদল করে কোথাও উঠে এলে মালপত্তর যে রকম মেঝেয় ছড়ানো-ছিটানো থাকে সে রকম কিছু বাক্স-তোরঙ্গ, বেডিং ইত্যাদি ইতস্তত রয়েছে। দড়ি-বাঁধা বেডিংটার উপর বসে আছে সুদাম। মাঝ-বয়সী অভাবী মানুষের চেহারা। পরনে ধুতি সার্ট। পকেট ডায়েরীতে বুক পকেটটা উঁচু, সেখানে দুটো কলম গোঁজা। অদূরে দরজার কাছে একজন মুটে হাঁটু মুড়ে বসে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। সুদাম চোখ বুজে গান করছে, মুটেটির মুখে বিরক্তির চিহ্ন।]

সুদাম। [মগ্নভাবে গাইছে]

বল রে জবা বল—
কোন সাধনায় পেলিরে তুই
মায়ের চরণ তল—
বল রে জবা বল—

[বেসুরো গলা অথচ ভক্তিভাবে আবিষ্ট হয়ে সুদাম এক একটি পদ তিনবার গায়। মুটে বিরক্তিতে প্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।]

মুটে। বাবু!

সুদাম। [ভ্রূক্ষেপহীন]

বল রে জবা বল—
কোন সাধনায় পেলিরে তুই—

মুটে। [খুবই বিরক্ত] ও বাবু!

সুদাম। [চোখ খুলে বিরক্ত মুখে] চেল্লাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ!

মুটে। চেল্লাব না! মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে তো না কি? আপনার গানের জ্বালায় আমার মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছে!

সোয়া ঘণ্টা ধরে এই এক কলি গান কাঁহাতক সহ্য হয়! টেম্পু থেকে মাল বয়ে দোতলায় তুলে দিয়েছি—পয়সা-কড়ি বুঝে নিয়ে চলে যাবো···তা না আমার রোজগার কামাই দিয়ে জুলুম করে বসিয়ে রেখে গান শোনাচ্ছেন। এটা আপনার একটা বিবেচনা হলো।

সুদাম। ঠাকুর দেবতার গান শুনলে মন-মেজাজ নরম হয়. তোর মতো উল্টোচণ্ডী আগে দেখি নি। নরকেও তোর ঠাঁই হবে না। পরজন্মের কথাটাও ভাবতে হয়।

মুটে। পরজন্মের কথা পরজন্মে। এ জন্মেই হালে পানি ধরছে না! একগাল মুড়ি চিবোনোর পয়সা জোটাতে আধা সের ঘাম ঝরাতে হয়। বসে থাকলে পেট শুনবে? যার পয়সা আছে বসে বসে ক্ষীরে লুচি ডুবিয়ে খেতে পারে—সে কপাল করে তো আমরা আসি নি।

সুদাম। লেকচার দিচ্ছিস! খুব কথা শিখেছিস!

মুটে। কথার ঝকমারিতে আমি যাবো না। আমার পাওনা মিটিয়ে দ্যান, চলে যাই।

সুদাম। দ্যাখ, তুই বড্ড মেজাজ দেখাচ্ছিস! তোকে বলেছি না, এ সব মালপত্তর আমার না। যে বাবুর মাল, সে এখুনি আসবে। আসা মাত্তর পাওনা গণ্ডা নিয়ে চলে যাবি।

মুটে। আপনি আমার সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক করেছেন, পাওনা আপনার কাছ থেকে নেবো। কে কার বাবু সে আমার দেখার দরকার নাই।

সুদাম। আমার ভাগ্যের দোষ তাই তোর মতো তিরিক্কি মেজাজের লোক কপালে জুটেছে। ঠিক আছে, তোর চার টাকা হয়েছে তো? এ ছাড়াও ওয়েটিং চার্জ আমি দেবো।

মুটে। কি দেবেন?

সুদাম। এই বসে থাকার জন্য বাড়তি দু'টাকা খেসারত তুই পাবি। এই নে।

[সুদাম টাকা দেয়।]

মুটে। বাবু এক্ষুণি আসবেন তো?

সুদাম। বলেছি তো এক্ষুণি আসবে।

মুটে। দশটা পয়সা ছ্যান, কটা বিড়ি নিয়ে আসি।

সুদাম। অমোকে একা ফেলে রেখে তোর কোথাও যাওয়া চলবে না।

মুটে। কেন?

সুদাম। সব টাতে খোঁচাবি না তো। তোকে বসে থাকার জন্যে পয়সা দিচ্ছি, তুই বসে থাকবি, ব্যাস!

মুটে। পয়সা দিচ্ছেন ঠিকই তবে জুলুমও করছেন। আপনি এমন কিছু কচিকাঁচা না যে একলা থাকলে ভিড়মি লাগবে। ঠিক আছে, পয়সা না দেবেন নিজের পয়সায় বিড়ি নিয়ে আসছি।

[মুটেটি যাবার উপক্রম করে।]

সুদাম! ওরে, আমাকে একা রেখে যাসনে রে! মাইরি বলছি, আমার ভিড়মি লেগে যাবে। ফিরে এসে আমাকে জ্যান্ত পাবি কিনা সন্দেহ। যাস নে বাবা!

মুটে। কি কাণ্ডটা বলেন তো? আপনার ভাব সাব আমার কেমন বেচাল ঠেকতেছে। ভয়টা কিসের আপনার?

সুদাম। একা থাকলে আমি বোধ করি বাঁচবো না।

মুটে। মারবে কে?

সুদাম। মারবে না—মটকাবে; ভূতে ঘাড় মটকে রেখে দিয়ে যাবে।

মুটে। ভূত? ভূত আসবে কোত্থেকে?

সুদাম। এটা ভূতের বাড়ি। পাঁচটা বছর এ বাড়িতে মনিষ্যির পা পড়ে নি। এখানে ভূতের রাজত্বি! আজ এই পেত্থম জন-মনিষ্যি এসে তেনাদের সুখ শান্তি ভণ্ডুল করতে চলেছে। ভূত কি তা কোনো কালে সহ্য করেছে, না করবে? [হঠাৎ লাফ মেরে সরে যায়] ওরে ব্বাবা!

মুটে। কি হলো?

সুদাম। পিঠে যেন কে নখের আঁচড় টেনে দিল রে!

মুটে। ঐ তো আরশোলাটা আপনার পিঠে পড়ে চলে গেল!

সুদাম। তাহলে বুঝতে পারছিস তো, আমার মনের অবস্থাটা কেমন? এট্টুখানি বোস। বিড়ির বদলে তোকে সিগারেট দিচ্ছি। আমার সঙ্গ ছাড়িস নে বাবা। বাবু না আসা পর্যন্ত নড়িস নে।

[সুদাম একটা সিগারেট দেয়, দেশলাই খোঁজে পকেটে।]

মুটে। শলাই আছে আমার কাছে।

[ট্যাঁক থেকে দেশলাই বের করে মুটে সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছেড়ে বসে।]

মুটে। বাড়িটায় ঢুকে আমারও কেমন সন্দ হচ্ছিল। কেমন গা ছমছমে ভাব আছে একখানা। তা ছাড়া ধারে পিঠে ঘরবাড়িও নেই। এমন রাজমহল—ভূতের রাজ্যি হয়ে পড়ে আছে! তা জেনে শুনে এখানে মরতে এলেন কেন?

সুদাম। সে অনেক কথা রে!

মুটে। না, কাজটা ভালো করেন নি।

সুদাম। সে কথা কারে বোঝাই! যিনি আসছেন তিনি একা এলে তাঁক ঝক্কি তাঁর হতো, সঙ্গে আবার আমাকেও পাকড়েছে। কপালের এমন গতিক না বলতেও পারি না আবার 'হ্যাঁ' বলে এখানে ঢুকে পড়েও হৃদ্‌কম্প থামানো যাচ্ছে না।

[দরজার বাইরে থেকে কথাবার্তা ভেসে আসে।]

সুদাম: এসে গেছেন! গলা পাচ্ছি। এবার তোর ছুটি হয়ে গেল।

[মাঝ বয়সী ভুবনবাবু প্রবেশ করেন। তাঁর দু কাঁধে দুটো থলে ঝুলছে, মালপত্তরে ঠাসা থলের ভেতর থেকে কৌটো, হাতা, সাঁড়াসি ইত্যাদি সংসারের টুকিটাকি উঁকি দিচ্ছে। দুই বগলে ঝাঁটা এবং ছাতা। দুই হাতে জিনিসপত্রে ঠাসা দুটো বালতি। গলায় ঝোলানো ওয়াটার বট্‌ল্ বুকের উপর।]

সুদাম। মালঠাসা ঠেলাগাড়ি হয়ে ঢুকলেন যে!

ভুবন। অবস্থা দেখে আমোদ হচ্ছে! একতলা থেকে হাঁক পাড়ছি আর তুমি কানে তুলো ঠেসে বসে আছ!

সুদাম। আমাকে ডেকেছেন ?

মুটে। শোনা গেল না তো ?

ভুবন। এ কে ?

সুদাম। মাল তুলেছে।

ভুবন। এতক্ষণ ধরে মাল তুলছে ?

সুদাম। বলছি, সব বলছি। আগে হাতের মালগুলান রাখেন।

ভুবন। তা একটু ধরতে পারো না এসে! হাত নাড়াতে পারছি। খিল ধরে আছে!

মুটে। আমি চললাম।

[মুটেটি চলে যায়। সুদাম এসে ভুবনের মালপত্তর নামাতে থাকে।]

ভুবন। আলমারিটা তোলা হচ্ছে। যাও, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে ওটা তুলে আনো। বাড়ি বদল করা সোজা কথা! তাও তো সিকি ভাগ জিনিষ এসেছে। [এদিক ওদিক তাকিয়ে] আর সব মালপত্তর কি হলো ? তোমার জিনিষ ?

সুদাম। পাঁচ পাঁচখানা ঘর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছি।

[একটা আলমারি নিয়ে জনা চারেক মুটে ঢোকে।]

ভুবন। সুদাম, গিয়ে ধরো না একটু!

[সুদাম আলমারির কাছে যায়। হাত চালায়।]

কুলি। আলমারি কোন দিকে যাবে ?

ভুবন। রাখ একটা ধার ঘেঁষে ··· এই এখানটায় রাখো।

[দেয়াল ঘেঁষে রাখার একটা জায়গা দেখায়। জীর্ণ, ভাঙাচোরা আলমারিটা যথাস্থানে রেখে কুলির দল হাঁফ ছাড়ে, গামছায় ঘাম মোছে। ভুবন ব্যাগ বের করে টাকা দেয়।]

ভুবন। ভাগ করে নিও।

কুলি। এ এক আজব আলমারি আপনার বাবু!

ভুবন। কেন ?

কুলি। ঠেলা থেকে যখন নামালাম ··· বেশ হাল্কা ··· তুলে আনতে দেখি কি ওজন রে বাপ্! ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে!

ভুবন। ওপরে তুলতে ভারি লাগবে না ?

কুলি। সে একটু লাগে। কিন্তু ওজন যে কী পরিমাণ বেড়ে গেল ··· মনে হলো পাথর ভরে তুলছি !

ভুবন। ভেতরটা তো খালি রে।

কুলি। কি জানি! তাজ্জব লাগছিল। চলি বাবু।

[কুলিরা চলে যায়।]

ভুবন। ওফ্, একটু জিরোনো যাক, কি বলো সুদাম ?

সুদাম। এত দেরি হলো যে আপনার ?

ভুবন। একবার দাদার বাড়িটা ঘুরে এলাম। তোমার বউদিদি, ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে পৌঁছলো কিনা, সে খবরটা নেবার ছিল। ওখানে সব জিনিষপত্তর ডাঁই করে পড়ে আছে দেখলাম। গোছগাছ করতে বারণ করেছি—আবার দুদিন বাদে এখানে এনেই তো তুলতে হবে। ঝুটমুট খাটুনির দরকার কি॥

সুদাম। এখানে থাকতে পারবেন ?

ভুবন। সে উদ্দেশেই তো আসা।

সুদাম। আমাকে না জড়ালেই ভালো করতেন।

ভুবন। কেন ?

সুদাম। আমার ভালো ঠ্যাকে না। ভূতের সঙ্গে খোঁচাখুচি করে থাকা ঠিক না। পাঁচ বছরে যেখানে কেউ থাকতে সাহস করলো না—সেখানে সুট করে এ রকম ঢুকে পড়াটায় ঝুঁকিটা কি কম ? বেঘোরে পেরাণ দেয়ার চেয়ে কষ্ট করে থাকাও ভালো।

ভুবন। ঐ সব চিন্তা ভাবনা চুকিয়ে বুকিয়ে তবেই না এখানে উঠে আসাটা সাব্যস্ত হলো। দ্যাখো, সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলোয়—আমরা না হয় দুঃখে পড়ে ভূতের কিল খাবো। তাছাড়া গোলমাল বুঝলে তো আর ভূতের সঙ্গে জবরদস্তি করে থাকবো না। সব কিছু তো সে জন্য আনিও নি। বাড়ির

লোকজনদেরও নিশ্চিন্ত জায়গায় রাখা আছে অবস্থা ভালো বুঝলে আনা যাবে, নইলে আমরাও থাকছি না। সাতটা দিন দু জনে থেকে হাওয়াটা বুঝে নিতে দোষ কি ?

সুদাম। সাতটা দিন কি সোজা কথা! ভূতের মুখোমুখি হলে একটি পলকই যথেষ্ট।

ভুবন। অহরহ দুশ্চিন্তা করতে থাকলে ভূতের দরকার নেই তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশটি করে বসে থাকবে। মনে জোর এনে ছাখা যাক না কি হয়।

[হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘড়িতে চারটে বাজার আওয়াজ হলো। ওদের চোখে মুখে ভয় ও বিস্ময়।]

ভুবন। পাশের ঘরে যে ঘড়িটা ছিল—সেটা বাজলো।

সুদাম। পাঁচ বছরের বন্ধ ঘরে ঘড়ি বাজায় কে ? ঘণ্টা তিনেক আছি—দুটো বাজলো না, তিনটে বাজলো না—হঠাৎ করে ঢং ঢং করে চারটে বাজার আওয়াজ! কেমন বোঝেন, ভুবনদাদা ?

ভুবন। কাল এ বাড়ির মালিকের লোক এসে ঘরদোর ঝাড়পোছ করে দিয়ে গেছে। হয়তো ঘড়িটাতেও দম দিয়ে রেখে গিয়েছিল।

সুদাম। তা ঘড়ি দম খেলে খালি চারটের সময়েই বাজবে কেন ?

ভুবন। কথাটা তোমার উড়িয়ে দেবার মতো না।

সুদাম। আলমারি তুলতে এসে মুটেটা যা বললো, তাও কিন্তু উড়িয়ে দেবার মতো না। হঠাৎ করে আলমারিটা ওদের খুবই ভারি মনে হয়েছে!

ভুবন। অথচ ওটা একদম ফাঁকা।

সুদাম। ঢুকতে না ঢুকতেই যদি এই হয়! আপনার মনের জোর থাকতে পারে—সবার তো নাই।

ভুবন। মনে আমার এখনো জোর আছে কিন্তু কোন অবস্থায় কতক্ষণ যে থাকবে তার হিসেবটা তো জানা নেই।

সুদাম। আমার কথা তো আগেই বলেছি, এ সবে ভয়-ভীতি আমার সাংঘাতিক। কম ভয়ে অজ্ঞান, বেশি ভয়ে হার্টফেল।

[সিঁড়িতে কাশির আওয়াজ। ওরা একটু চমকে যায়।]

অনাদি। [নেপথ্যে] ভুবনবাবু এসে গেছেন?

ভুবন। [আশ্বস্ত] অনাদিবাবু নাকি? আসুন আসুন।

[অনাদিবাবু ঢোকেন। মাঝবয়সী। চেহারা—পোষাকে স্বচ্ছলতার ছাপ—একটু বাবু ধরণের বেশ-বাস।]

অনাদি। তাহলে এসে গেলেন? খুব ভালো। নিশ্চিন্তে থেকে যান।

ভুবন। দেখি।

অনাদি। দেখার কিছু নেই। খালি মনের জোর।

ভুবন। তা তো বটেই।

অনাদি। একটা বছর বিনে ভাড়ায় এত বড় বাড়ি—মিছে ভয় পেয়ে এই অর্থ কষ্টের দিনে কিছুতেই ছাড়বেন না! ভূত বলে এখানে কিচ্ছু নেই। দুষ্টু লোকের রটনায় বিশাল বাড়িটা পাঁচটা বছর ধরে ফাঁকা পড়ে আছে। আর ঘোষবাবুও হচ্ছেন কাছা খোলা মানুষ,—বাড়িটাকে যে কাজে লাগাবে, সে বুদ্ধিও নাই, খেয়ালও নাই। বাড়ি তো আমার না, কিন্তু অনর্থক বাড়িটার এই ধ্বংস দেখে আমার বুদ্ধিটা তিনি কানে তুলতে আপনাকে এনে তুললাম। ঘোষবাবুও আমার বন্ধু, আপনাকেও বন্ধু মনে করি—এক ঢিলে দু জনার সমস্যা সমাধান হয়ে গেল।

ভুবন। কিন্তু এক বছর পর? তখন তো আবার সমস্যা।

অনাদি। বলেছি তো আপনাকে। একটা বছর বাড়িটায় থেকে আপনি যদি ভূতের বাড়ির অপবাদটা ঘুচিয়ে দিতে পারেন--ঘোষবাবু তিনখানা ঘর, অবশ্য একতলায়, আপনাকে নাম মাত্র ভাড়ায় ছেড়ে দেবেন। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে তার

কথাবার্তা হয়ে গেছে। আরে মশাই, নিজের আমার বাড়ি আছে, নইলে আমি নিজে এখানে উঠে আসতাম। ভূত! ভূতের বাড়ি! যা নেই, তার তোয়াক্কা আমি করি না। ভূতের ভাবনায় গুলি মেরে গ্যাঁট হয়ে থেকে যান তো!

ভুবন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়া হয় নি। (সুদামকে দেখিয়ে) সুদাম নস্কর (নমস্কার করে) আর অনাদিবাবুর কথা তো তোমাকে বলেছি (অনাদিবাবু নমস্কার করে)।। ওর দৌলতেই বাড়িটা পাওয়া গেছে। (অনাদিকে) সুদাম আমার রিলেটিভ—ভেবেছি ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দেবো।

অনাদি। আপনায় তিনখানা ঘর—আপনি তা দিয়ে যা খুশি করতে পারেন।

ভুবন। ওর অবস্থাও আমার মতই। এখন বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে ছু'শ টাকা—ওটা বাঁচাতে পারলে খুবই ওর উপকার হয়।

অনাদি। তা ছাড়া দুটো ফ্যামিলি থাকলে মনে একটা ভরসাও আসে। তবে একটা কাজ করেন ভুবনবাবু, এখুনি ঘোষবাবু আসবেন।

ভুবন। এখানে?

অনাদি। বাতব্যাধিতে তাঁর যে অবস্থা তাতে তো দোতলায় উঠতে পারবেন না। আমাকে বলে দিয়েছেন নিচে ওর গাড়ি আসবে। ওখান থেকে হর্ন বাজবে। আপনি একবার যাবেন। সব ঘরের চাবিগুলো আপনার হাতে দিয়ে দেবে। রোজ একবার খুলে দিতে হবে আর কি। যখন যাবেন, সুদাম বাবুর সঙ্গেও পরিচয়টা করিয়ে দেবেন।

ভুবন। নিশ্চয়ই।

সুদাম। আচ্ছা একটা স্বস্ত্যয়ন করে নিলে কেমন হয়। বাড়িটাকে শুদ্ধ করে নেয়া আর কি।

অনাদি। আপনি রাখেন তো। ও সব হচ্ছে মনকে প্রবোধ দেওয়া। নিজে শক্ত থাকতে পারলে কিচ্ছুর দরকার নাই। আমার

অত পুতুপুতু নাই—বলেন তো একলা রাত কাটিয়ে যাবো। ভূত আমার সামনে পড়লে পালাবার পথ পাবে না।

[বাইরে থেকে মোটরের হর্ন শোনা যায়।]

ভুবন। ঘোষবাবুর মোটরের হর্ন বোধ হয়।

অনাদি। হ্যাঁ, ওরই গাড়ি।

ভুবন। তাহলে আপনি একটু বসেন। আমি সুদামকে নিয়ে দেখা করে আসি। (খবরের কাগজটা দিয়ে) আজকের কাগজ —দেখেন ততক্ষণ।

সুদাম। একলা থাকতে অসুবিধে হবে না তো ?

অনাদি। এক্কেবারে না। এতক্ষণ তো ভূতের সম্পর্কে চ্যালেঞ্জিং কথাবার্তা বলে গেছি। একলা পেয়ে যদি এসে হাজির হয় খুবই ভালো কথা, আড্ডা মেরে সময় কাটাবে।

সুদাম। আপনার মতো হতে পারলে আর কথা ছিল না।

ভুবন। আচ্ছা, আসি তাহলে।

অনাদি। আসুন। বলবেন, আমি এখানে আছি রাত্তিরে পারি তো একবার ওর সঙ্গে দেখা করবো।

ভুবন। বলবো।

[ওরা দুজন চলে যায়। অনাদি ঘরের চারদিকটা দেখে। খবরের কাগজটায় চোখ রাখে। হঠাৎ একটা ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ। অনাদি চমকে তাকায় আলমারিটার দিকে। কারণ ওদিক থেকেই শব্দটা আসছিল। আবার শব্দ—আলমারিটার ভিতর থেকে কে যেন দরজায় আঘাত করছে। অনাদির মুখ চোখ ভীত হয়ে ওঠে। অনড় ভাবে ঐ দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। হঠাৎ দেখা যায় ভাঙা আলমারিটার এক ধারের একটা পাল্লা খুলে গেল। ধীরে ধীরে ছন্নছাড়া দেখতে একটি মনুষ্য মূর্তি বেরিয়ে এল। অনাদির বিস্ফারিত চোখ, বিপর্যস্ত। ওর গলা থেকে একটা বিজাতীয় কাতরোক্তি বেরুলো। একটা ঢোঁক গিললো। মূর্তিটি অস্ফুট স্থির অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে।]

অনাদি। যা বলেছি, মনের কথা না। ভূতে আমার ষোল আনা ভয়। এবারের মতো মাফ করে দিন !

ভূত। আমাকেও মাফ করে দিন!

অনাদি। অ্যাঁ!

ভূত। আমি নিচের সিঁড়ির কাছে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ এই আলমারিটা এনে রাখলো। বেরুবার পথ খুঁজি। লোকজন এদিক ওদিক। কি করি? আলামারিটার পাল্লা খোলা—ঢুকে পড়লাম। মাথায় করে আমি-সমেত আলমারিটা তুলে নিয়ে এলো। চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি।

[হাঁটু তুলে তুলে ধীরে পা ফেলে দরজার দিকে মনুষ্য মূর্তিটি এগুতে থাকে। এমন সময় ভুবনবাবুর গলা শোনা যায়। কিছু বলতে বলতে ওরা আসছে। লোকটি দ্রুত পিছিয়ে আলমারিটার কাছে যায়। ঠোঁটে তর্জনী চেপে অনাদিকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে। অনাদি স্থির বিমূঢ় তাকিয়ে থাকে। আলমারির মধ্যে লোকটি ঢুকে পড়ে। ভুবন এবং সুদাম ঢোকে। অনাদিকে একদৃষ্টে নির্বাক তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবিত হয়।]

ভুবন। অনাদি বাবু!

[অনাদি ঐ অবস্থাতেই নিজের ঠোঁটে তর্জনী রেখে চুপ করতে ইঙ্গিত করে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। ধীরে নিজেকে সামলে একটু স্বাভাবিক হয়।]

সুদাম। কি হলো?

[অনাদি ফের ঠোঁটে তর্জনী চেপে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।]

ভুবন। ব্যাপারটা কি? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।

সুদাম। যা দেখলেন, তাতে আপনি ছাড়া কারুরই কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। অনাদি বাবু, কি বলবো, ভেনার দেখা পেয়েছেন। এবার আর কোনো কথা না—দরজা বন্ধ করে চলেন। আর এক মুহূর্ত এখানে না।

ভুবন। আগে চুপ করে বসুন তো!

সুদাম। আপনি কিন্তু খুবই বাড়াবাড়ি করতেছেন।

ভুবন। সুদাম, ক্ষতি করতে যদি তারা চায় তাহলে এখান থেকে পালাবার সময় তোমাকে দেবে না—এটা মানো তো?

সুদাম। এক শ' বার মানি।

ভুবন। তাহলে এক্ষুণি যাও আর দু ঘণ্টা বাদেই যাও তাতে কিছু আসে যায় না।

সুদাম। তাই বলে আহাম্মকের মতো ভয়ের মুখোমুখি হয়েই বা বসে থাকবো কেন? আপনার এ গোঁয়াতুর্মিই বা কেন? আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—ভূতের বাড়ির একটা নেশা আছে। আমার কথা যদি জানতে চান তো, এক্ষুণি চলেন।

ভুবন। কোথায় গিয়ে উঠবো? ভাড়া বাড়িও তো ছেড়ে দিলাম।

সুদাম। আমি দেইনি। পথে শুয়ে থাকবো।

ভুবন। তোমার আমার কতগুলো টাকা মাসে মাসে বাঁচতো। সংসারের সুখ শান্তি খানিক বাড়ানো যেত।

সুদাম। সবার আগে তো প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখেন।

ভুবন। বাঁচাটা তো আমাদের কাছে যুদ্ধ, সুদাম। ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টাটা একবার করে দেখবে না!

সুদাম। পরিষ্কার, আপনাকে ভূতুড়ে বাড়ির নেশায় পেয়েছে। আমার হলো মহা ফ্যাসাদ, আপনাকে একা ফেলে যাওয়াও ঠিক হবে না, আবার সঙ্গে থাকলে জোড়া-মৃত্যু!

ভুবন। সুদাম, ঘোষবাবু বললেন না—অনেক ভূত আছে তারা মানুষ বুঝে ভয় দেখায়। তুমি আমি তো কারুর কোন ক্ষতি করি নি। কোন মতে দুনিয়ার এক কোণে থেকে নাম মাত্তর সুখ পেলে বর্তে যাই—আর সেটুক খুঁজে খুঁজে নিজেরা হয়রান হচ্ছি—অন্য কারুর গায়ে একটা আঁচড় কাটার বাসনাও করি নি। মনে হয়, আমাদের ওরা কিছু করবে না।

সুদাম। এই নিশ্চিন্তি নিয়ে মরতে চান, আমি আর কি বলবো! কপালে যা আছে খণ্ডানো যাবে না। আপনি তো আমাকে ধরে রাখছেন না—অদেষ্টে যা আছে তা-ই ঘটে চলেছে।

ভুবন। অন্তত একটি রাত্তির দ্যাখো।

সুদাম। আমাকে কিছু বলার দরকার নেই। আপনার যা মন চায় করেন, আমি 'সারেণ্ডার' করলাম।

ভুবন। আলমারির মধ্যে এক বাণ্ডিল মোম রেখেছিলাম। এনে টেবিলে রাখো। ঘোষবাবু বলেছেন, ইলেকট্রিকের লাইন কালকেই মেরামত করে দেবে। আজকের দিনটা মোম দিয়েই চালাই।

সুদাম। আলমারির চাবিটা ছ্যান।

ভুবন। ভাঙা আলমারির আবার চাবি। ডালা খোলাই আছে।

[সুদাম আলমারির ডালা খুলেই এক পলক অবিচল তাকিয়ে মাটিতে বসে ঢলে পড়ে। ভুবন ব্যাপারটা দেখে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকে। আলমারির ভেতর থেকে সেই মানুষটি সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়। লোকটির মুখ কেমন করুণ দেখাচ্ছে। লোকটি হাত তুলে ভুবনকে নমস্কার করে। ভুবন আড়ষ্টভাবে প্রতি নমস্কার করে। ভুবন এবার মুখটি ধীরে ঘুরিয়ে কাগজের দিকে তাকায়। লোকটি এবার নিঃশব্দে করুণ হাসে। বহুকষ্টে ভুবনও মুখে নীরব হাসি ফোটায়। দুজন দুজনের দিকে অপলক তাকিয়ে। ভুবন এবার হাত জোড় করে, তারপর হাতের ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে চলে যাবার অনুরোধ জানায়। দুবার এরকম অনুরোধ জানাতে লোকটি খুব ধীরে ফিল্মের 'স্লো-মোশনের' ভঙ্গিতে হাঁটু তুলে বড় বড় দূরত্বের পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আলো নিভে অন্ধকার হয়ে যায় মঞ্চ। মুহূর্ত কয়েক পরে মঞ্চ আবার আলোকিত হয়ে ওঠে ভুবনের হাতে ধরা একটা মোমের আলোয়। ভুবন আর একটি মোম জ্বালিয়ে নেয়, সুদাম বেডিং-এর উপর চুপচাপ বসে আছে। কাছাকাছি বসে ভুবন। দুটি মোমের আলোর মধ্যে রহস্যময় পরিবেশে দুটি প্রাণী—ভুবন আর সুদাম।]

ভুবন। সুদাম!

সুদাম। বলেন।

ভুবন। এখন কেমন বোধ করছো?

সুদাম। হাল্কা লাগছে।

ভুবন। মুচ্ছো যাবার উপক্রম আমারো হয়েছিল, কোন রকমে টালটা সামলে নিয়েছি।

সুদাম। আমি তো মুচ্ছো যাই নি।

ভুবন। তবে? দেখলাম তুমি টলে পড়লে?

সুদাম। না গো ভুবন দাদা, আমাকে ওরা কোলে তুলে নিলো, আরামে আমি গা টা শুধু এলিয়ে দিয়েছিলাম।

ভুবন। কারা ?

সুদাম। আমার মা আর বাবা। সঙ্গে এসেছিলেন আরো অনেকে— মুখগুলো ঝাঁপসা, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

ভুবন। কিন্তু ওরা তো অনেক কাল হলো মারা গেছেন, সুদাম।

সুদাম। তবুও এলেন। আমি তাঁদেরই সন্তান তো! ওঁরা বললেন, সুদাম, তোর খুব দুঃখ না রে! সহ্য করে করে আমরা গত হলাম, তুইও সহ্য করে চলেছিস, তোর ছেলের কপালেও বুঝি তা ই। এমন হলে তো চলে না। একটা কিছু কর রে সুদাম; কিছু একটা কর। বলতে বলতে তাঁরা মিলিয়ে গেলেন।

ভুবন। আর আমার কি হলো জানো ?

সুদাম। বলেন।

ভুবন। যতক্ষণ সেই মনুষ্য-আকার মূর্তি ঘরে ছিল, আমি ছিলাম সজ্ঞান। সে বেরিয়ে গেল ঐ দরজা দিয়ে। আস্তে আস্তে আমার মাথাটা নুয়ে পড়লো। যেন একটা বোঝা আমার মাথার উপর কে চাপিয়ে দিল। কি তার ওজন। কষ্টে চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। সুদাম, বললে বিশ্বাস হবে না, আমি চোখের জলের মধ্যে পরিষ্কার একটা দৃশ্য দেখলাম—আমার বৌ, ছেলেমেয়ে, বুড়ো মা আমার ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের মধ্যে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে, হাত পা ছুঁড়ে বলছে, 'ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি! ধরো ধরো !!' তখন আমিও মুচ্ছো যাই যাই, কোন রকমে টালটা সামলে নিয়েছি।

সুদাম। আমাদের জীবনটা বড় গোলমেলে ছিল ভুবন দাদা।

ভুবন। 'ছিল' বলছো কেন গো সুদাম ?

সুদাম। যে জীবনটা থেকেও নেই তাকে 'আছে' বললে কি মানায় ভুবন দা ?

ভুবন। তবুও তো আমরা থাকি।

সুদাম। থাকার লোভে না কি কিছুর আশায়?

ভুবন। অত কি আমি বুঝি, সুদাম। তবে মনে হয়, কিছুর আশায়।

সুদাম। বড় হাসি পায় ভুবন দাদা! পঞ্চাশ বছর ধরে আমি আশা করলাম, আর আপনি পঞ্চান্ন বছর ধরে। ধৈর্য ধরার এমন ক্ষ্যামতা আমাদের, অথচ কেউ তারিফ করলো না!

[ওদের পিছন দিক থেকে সেই মনুষ্য আকার মূর্তি সন্তর্পণে ঢোকে। সে চোখ মুছছে। মনে হবে কাঁদছে। ওদের পিছন দিকটায় বসে পড়ে। কি অনুভব করে ভুবন আড় চোখে ওকে একবার দেখে নেয়।]

ভুবন। সুদাম!

সুদাম। বলেন।

ভুবন। এখন আমাদের ভয় অনেকটা কমে গেছে তাই না?

সুদাম। মনে তো হয়।

ভুবন। যদি ভুত এসে আমাদের চোখের সামনে হাজির হয়, ভয় পাবে?

সুদাম। না বোধ হয়।

ভুবন। আমার হাতটা ধরো।

সুদাম। কেন?

ভুবন। যদি ভয় পাই বুঝবো তুমি আছ, আর যদি তুমি ভয় পাও বুঝবে আমি আছি।

সুদাম। সে ভালো কথা।

[ওরা দু জন হাত ধরে বসে।]

ভুবন। এবার একটা কথা বলি।

সুদাম। কি বলবেন আমি জানি। সে আমাদের পিছনে এসে বসে আছে তো?

ভুবন। হ্যাঁ, সুদাম।

সুদাম। চোখ মুছছে তো?

ভুবন। হ্যাঁ, সুদাম।

সুদাম। ভূত কাঁদছে, হাসি পাচ্ছে না,, ভুবন দাদা ?

ভুবন। খুবই হাসি পাচ্ছে।

সুদাম। তাহলে দুঃখের মরণ নাই, বলো ?

ভুবন। [গেয়ে ওঠে]

দ্যাখো ভূতের চোখের জল !

দেহ মন সবই গ্যাছে

জীবন জ্বলে ছাই হয়েছে

তবু নয়ন ছল ছল !

দ্যাখো, ভূতের চোখে জল !

ভূত। [কান্না মিশিয়ে গায়]

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,...

মরে কেন টিঁকে আছি !

শূন্য জীবন শূন্য হতে

বাকি কত বল ?

ভুবন। [গান]

দ্যাখো ভূতের চোখে জল !

[এবার তিনজনে সম্মেলকে গায়—'আহা ভূতের চোখে জল।']

সুদাম। ও ভূত ?

ভূত। উঁ।

সুদাম। গানের মধ্য দিয়ে তিনজনে বেশ ভাব হয়ে গেল, তাই না ?

ভুত। হুঁ।

[ভূত আগের মতো ফুঁপিয়ে চলে। ওরা দু জন এবার ওর দিকে ঘুরে বসে। ভুবন ধীরে উঠে ভূতের কাছাকাছি যায়।]

ভুবন। কাঁদছেন কেন ভাই ?

ভূত। মন থেকে ভালোবেসে 'ভাই' বলে ডাকলেন ?

ভুবন। হ্যাঁ, ভাই।

[ভূত এবার হুহু করে কাঁদে। সুদাম উঠে আসে।

সুদাম। কি হলো ?

ভূত। জীয়ন্তে এই ভালোবাসার কাঙাল ছিলাম। ইচ্ছে ছিল, চার দিক থেকে সবাই ডাকছে, 'ভাই, ও ভাই!'

ভুবন। চোখটা মোছ, দুটো কথা কই।

[ভূত চোখ মোছে। কান্না সামলেছে।]

ভুবন। তুমি কি মরে গেছ?

ভূত। তাছাড়া কি!

সুদাম। কি ভাবে মরলে?

ভূত। সংসার চাপা পড়ে, ভাই।

ভুবন। সংসার চাপা পড়ে?

ভূত। হ্যাঁ।

সুদাম। সে তো আমরাও চাপা পড়ে আছি।

ভূত। ·· তাহলে তো মৃত্যু যন্ত্রণাটা কেমন তা জানা আছে। আমি কিন্তু সংসার চাপা পড়ার পরেও বেশ কয়েক বছর বেঁচে ছিলাম। তবে ভারি পাথর চাপা পড়লে যা হয়। সুখ-শান্তির আশায় কোথাও যাবো, উপায় নাই—দু পায়ের জোর চলে গেছে। যা মন চায় হাত বাড়িয়ে যে ধরবো, উপায় নাই—আঙুলগুলা অবশ। চোখ মেলে যে নিজের ভবিষ্যৎটা দেখবো, তারও উপায় নাই—দৃষ্টি পাথরে ঘষা খেয়ে কি ঝাপসাই না হয়ে গেল! অথর্ব জীবন! এক সময় যেটুকু সার ছিল—তাও গেল!

ভুবন। তুমি কি আমাদের জীবনের কথা বলে গেলে?

সুদাম। এই বৃত্তান্ত।

ভূত। এখানে যারা থাকে সবারই ঐ একই বৃত্তান্ত। সবাই ভুগেছি একই ব্যাধিতে।

ভুবন। এখানে আর কেউ থাকে?

ভূত। এই ঘরে না। ঘর তো তালাবন্ধ থাকে। একতলায় যে বড় বারান্দাটা আছে, ভাঙা পাঁচিলটার ফাঁক দিয়ে আমরা ওখানে আসি, অনেকে। সুখ-দুঃখের কথা বলি। সময় কাটে।

ভুবন। তাহলে ভূতেরও সমাজ আছে ?

ভূত। সব আছে। এমন কি চিকিচ্ছের জন্য ব্যবস্থাও আছে।

সুদাম। ভূতের আবার কি চিকিচ্ছের জন্য ব্যবস্থাও আছে।

ভূত। আছে। আমারও তো চিকিচ্ছে হচ্ছিল। ভালো লাগলো ন্য। বলতে পারো পালিয়ে বেড়াই। কি হবে আমার চিকিচ্ছে দিয়ে। সব এত বিস্বাদ লাগে। কিছুই আর চাই না। একজন ডাক্তার এসেছে। বলছে, সব ভূতের মুক্তি হয় হয়—এমন ওষুধ সে বাতলে দেবে। যেখানে যত ভূত সব জড়ো করছে। মুক্তির পর এক মহা মিছিল বেরিয়ে পড়বে।

সুদাম। সত্যি কথা ?

ভূত। বলছে তো। তবে আমি আমার নিজের মুক্তি নিজেই খুঁজে নেবো। মুক্তির চেষ্টা তো কম করছি না—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাই কাঁদি—দেখছিলে না, একটু আগেই কাঁদছিলাম। আবার চেষ্টা করে দেখি।

[ভূত দাঁড়িয়ে দুহাত পাখির ডানার মতো নাড়িয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভুবন আর সুদাম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভূত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।]

ভূত। হচ্ছে না।

ভুবন। কি ?

ভূত। আমি ভূত—অথচ ভূতের মতো অদৃশ্য হয়ে ভেসে যেতে পারছি না। আই কাণ্ট ডিসঅ্যাপিয়ার ! মিলিয়ে যেতে পারছি না। তোমরা চেষ্টা করে দেখেছ ?

সুদাম। আমরা ?

ভূত। হ্যাঁ।

ভুবন। আগে মরতে দাও।

[ভূত অদ্ভুত হাসে।]

ভূত। আমাকে ভয় পাও ?

সুদাম। না।

ভূত। আগে ভয় পেতে ?

ভুবন। পেতাম।

ভূত। এখন একেবারেই ভয় পাও না তো ?

ভুবন। না।

ভূত। তার কারণ, তোমরা মরে গেছ। আমাকে প্রথম দেখার পর ভয়ে মরে গেছ। ভূতের ভয়ে না—নিজেদের ভৌতিক ভবিষ্যৎ দেখে। ভয়ে মরে গেছ।

ভুবন। না! আমি বেঁচে আছি।

ভূত। ও রকম মনে হয়।

ভুবন। আমি ইচ্ছে হলে এক্ষুণি আপনজনের কাছে চলে যেতে পারি। এক সঙ্গে থাকতে পারি। আফিস যেতে পারি। ট্রামে-বাসে উঠতে পারি। আগে আগে যা পারতাম এখনো তার সবই পারি।

ভূত। ভূত হবার পর এ সবই পারা যায়। এ এক অদ্ভুত মায়া। ভূত কিছুকাল নিজেই বুঝতে পারে না যে সে মরে গেছে।

[সুদাম রহস্যময় হাসে।]

ভুবন। হাসছো কেন সুদাম ?

সুদাম। একটু আগে আমি বলেছিলাম, 'আমাদের জীবনটা বড় গোলমেলে ছিল ভুবন দাদা'। শুনে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছিল' বলছো কেন গো সুদাম? তখনই আমি বুঝেছিলাম—জীবনটা একদিন ছিল, আর নেই। পাস্ট টেন্স। অতীত কাল। আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি বেঁচে নেই—ভূত হয়ে আছি।

ভুবন। কি বলছো সুদাম ?

সুদাম। ঠিকই বলছি। আর মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই ভুবন দাদা। আসেন, চেষ্টা করে দেখি আমরা 'ডিসঅ্যাপিয়ার' করতে পারি কিনা।

ভুবন। সুদাম, তুমিও বলছো, আমি আর নেই ?

সুদাম। বলছি।

ভূত। প্রমাণ করতে পারবে যে বেঁচে আছ?

ভুবন। কি ভাবে?

ভূত। সে তুমি জানো। আচ্ছা—ঐ যে জানলার ওপারের গাছটা —ওটা বেঁচে আছে না মরে আছে?

ভুবন। বেঁচে আছে।

ভূত। কেন?

ভুবন। ওটা নড়ে চড়ে।

সুদাম। ঐ ছাতাটাও নড়ানো চড়ানো যায়। মাথার উপর যে ফ্যানটা ঘোরে, সেটাও নড়ে চড়ে। সে তো জ্যান্ত কিছু না।

ভূত। গাছটার যদি ডালপালা গজায়—সেটা বাঁচার ধর্ম বজায় রাখে আর যদি ও সব ঝরে যায়, জীবনে আর কিছুই গজায় না তাহলে সেটা মরলো না কি?

ভুবন। হ্যাঁ।

ভূত। তোমার জীবনটায় সব কিছু ঝরে যাচ্ছে না গজিয়ে উঠছে?

ভুবন। ঝরে যাচ্ছে।

ভূত। তাহলে? বেঁচে আছে বাঁচার মায়া—বাকি সব ছায়া ছায়া।

সুদাম। এই মায়া কাটাতে হলে অদৃশ্য হয়ে ভেসে যেতে হবে। দূরে অনেক দূরে—সব কিছু ভুলে যাবার জায়গাটায় চলে যেতে হবে। আসেন, ডিসঅ্যাপিয়ার হতে পারি কিনা দেখি।

[সুদাম ভুবনের হাত ধরে কাছে নিয়ে আসে। তিনজন আগের মতো ভঙ্গিতে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করে। ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়।]

সুদাম। আমরাও অদৃশ্য হতে পারছি না।

ভূত। তাহলে আর একভাবে চেষ্টা করতে হবে। পাশের ঘর থেকে ছাদে ওঠার সিঁড়ি চলে গেছে। আমরা তিনজন ছাদে উঠে যাবো। তারপর তিনজনে ছাদের পাঁচিলের ওপর উঠে দাঁড়াবো। ঝাঁপ দিয়ে মহাশূন্যে ভেসে যাবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

ভুবন। যদি নিচে পড়ে যাই!

ভূত। অন্তত মরবে না—কারণ তুমি মরেই আছ।

ভুবন। আমি এ সবে নেই।

সুদাম। ভুবন দাদা, এখনো আপনার মিথ্যে মায়া রয়ে গেছে। ছাখেন আমি কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। চলেন, আমার হাতটা ধরে চলেন। ভয় কি? ভয়ের দিন তো চুকিয়ে এসেছি। (ভুবনের হাত ধরে) চলেন, আমার হাত ধরে চলেন। ছু জনের একই জীবন···হাত ধরাধরি করে চলে যাই।

[তিনজন পাশের ঘরের দিকে ধীরে এগিয়ে চললো। ভুবন অনেকটা সম্মোহিতের মতো হেঁটে যায়। হঠাৎ দরজা দিয়ে ছুহাতে ছুটো জলন্ত মোম নিয়ে একজন প্রবীণ ব্যক্তি ঢোকে। দেখে মনে হয় ডাক্তার। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে ওঠে—'হল্ট'! ওরা থামে। ডাক্তারের দিকে তাকায়।]

ডাক্তার। হল্ট! (ভূতটিকে) কাছে এসো। এসো।

[ভূতটি বাধ্যের মতো ডাক্তারের অনেকটা কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।]

কোথায় যাচ্ছিলে?

ভূত। ছাদে।

ডাক্তার। ওদের নিয়ে?

[ভূত মাথা নাড়ে।]

ডাক্তার। ওরা মৃত?

ভূত। আপনার মতোই মৃত।

ডাক্তার। কিন্তু আমার মতোই কি ওরা মুক্তি চায়?

ভূত। আমার মতো মুক্তির দিকেই ওদের নিয়ে যাচ্ছিলাম।

ডাক্তার। কেন?

ভূত। আমার স্বাধীনতা আছে কি নেই?

ডাক্তার। আছে।

ভূত। তাহলে ঠিকই করেছি।

ডাক্তার। কিন্তু আমার চোখের সামনে এ সব ঘটতে দেবো না। আমি একজন ডাক্তার। কোথাও কোথাও আমার জোর করার

অধিকার থাকে। (ভুবন এবং অনাদিকে) আপনারা নিজেদের ইচ্ছে মতো চলতে পারেন—কিন্তু মূর্খের মতো চলতে পারেন না। আপনাদের এই ভৌতিক জীবনে আমি এমন একটি ব্যায়ামের নির্দেশ দিতে পারি যাতে এই জীবনটা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেটি অভ্যাস না করে এ ভাবে বিদায় নেওয়া মূর্খতাই হবে।

ভূত। কত দিনের ব্যায়াম ?

ডাক্তার। ব্যায়াম করে আরাম বোধ হলে চিরটা কালই করতে পারবে।

ভূত। ঐ ব্যায়াম করে আমি কি ডিসঅ্যাপিয়ার হতে পারবো ? অদৃশ্য হওয়া সম্ভব ?

ডাক্তার। অদৃশ্য গতিবিধি সম্ভব।

ভূত। ঠিক বলছেন ?

ডাক্তার। ঠিক কি বেঠিক নিজেই বুঝে নেবে। বেঠিক মনে করলে তোমার নিজের পথ তো খোলাই রয়েছে। (ভুবন ও অনাদিকে) আপনারা আপনাদের পরিজনদের এখনো ভালোবাসেন ?

ভুবন। বাসি।

[সুদাম ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায়।]

ডাক্তার। তাহলে এই ব্যায়ামে তারাও সুখী হবেন।

সুদাম। ব্যায়ামটা কি রকম ?

ডাক্তার। প্রথমে চিন্তা।

ভূত। কিসের চিন্তা ?

ডাক্তার। কি ভাবে মরলেন তার চিন্তা।

ভূত। আপনি জানেন, আমি মরেছি সংসার চাপা পড়ে।

ভুবন। আমরাও।

ডাক্তার। একটা গাছ চাপা পড়ে যখন কেউ মরে, তখন গাছটার দোষ নাও হতে পারে। হয়তো একটা ভয়ংকর ঝড় তার কারণ। ডাক্তার হিসেবে আমি আপনাদের কারণটা খুঁজতে চিন্তা

করতে বলবো। চিন্তা করলেই দেখবেন ঐ সংসার চাপা পড়ার পেছনে রয়েছে একটি অপশক্তির ক্রিয়া কাণ্ড। নাউ ইউ, অ্যাটাক! ঐ দুষ্ট কারণটাকে আক্রমণ করুন। এই আক্রমণই আপনার ব্যায়াম।

ভুবন। কিছুই নেই আমার, কি দিয়ে আক্রমণ করবো?

ডাক্তার। ভূতের অভাব নেই, সব জড়ো হয়ে যান। এক ভূতের যা কর্ম নয়, তা দশ ভূতে পারে, দশ ভূতের যা কর্ম নয় তা করবে একশ—এইভাবে বাড়ুক। ভূতের একটা ক্ষমতা আছে—তা কারুরই অজানা নয়—ভূত ঘাড়ে চাপতে পারে। এটাই আপনাদের ব্যায়াম, অ্যাকৃশন—ঘাড়ে চাপুন, যে ভূত গড়ে, চাপুন তার ঘাড়ে। এ সবে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন—

[ডাক্তার হাতের ইঙ্গিত করতে অনেক চরিত্র মঞ্চে ঢুকে পড়ে। তারা গান ধরে। এক সময় ওরা তিনজনও গানে যুক্ত হয়।]

মিলিত কণ্ঠ। [গান] যে ভূত গড়ে তার ঘাড়ে চাপুন।
ভূতের চোখে আছে চিতার আগুন…
অন্ধকারে সেই আগুন জ্বালুন।
যে ভূত গড়ে তাকে খুঁজে দেখুন
যে ভূত গড়ে তার ঘাড়ে চাপুন।
এমনি করে সব আবার বাঁচুন—
যে ভূত গড়ে তার ঘাড়ে চাপুন!

[গানটি তুঙ্গে উঠতে পর্দা পড়বে।]

নাটকটির অংশ বিশেষে একটি বিদেশী রচনার আকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে। —নাট্যকার।